পীতাম্বর সাণ্ডেল

সকাল বেলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াই পীতাম্বর ওরফে পিতোমবাবু একটা দেড় বিঘত আন্দাজ হাই তুলিয়া ও সেই সঙ্গে চিনে পট্‌কা ছোঁড়ার মত তিনটা তুড়ি দাগিয়া স্বগত বলিলেন, "হন্মে হয়ে উঠেছি। কি কুক্ষণেই যে পুন্নাম নরক 'এভয়েড' করবার জন্যে এ কাজ করতে গিয়েছিলাম—উঃ, কেঁদে, কোকিয়ে, গালিয়ে, চেঁচিয়ে গিন্নি যেন মেনিন্‌জাইটিসের মত মাথার ভিতরটা ছারখারে দিতে বসেছে; আর ছেলেটা 'আওয়ারে', 'হাফ-আওয়ারে', 'কোয়ার্টারে' গির্জ্জের ঘড়ির মত হাঙ্গামা ক'রে ঘুমের পাট একেবারেই তুলে দিয়েছে। এর পর এক দিন কিছু একটা ক'রে বসব ব'লে রাখছি—পিতোম সাণ্ডেল রাগ করে না, করে না; কিন্তু করে যখন···তখন হুঁ··· ম্‌ ম্‌···।"

পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠে কে বলিল, "ওগো, এখানে অন্ধকারে সিন্দুকটার ভেতর অবধি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, এটা একটু বারান্দায় বার ক'রে দাও তো। রিং থেকে সেফ্‌টি-পিনটা যে কোথায় খুলে পড়ল—কিছুতে যদি হাতড়ে পাচ্ছি!"

পিতোমবাবু মনে মনে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "অত্যাচার, অনাচার, অরাজকতা! সেফ্‌টি-পিন পাচ্ছ না ব'লে আমি এখন ঘুমের চোখে তোমার পিতামহের আমলের জাহাজী সিন্দুকটা কাঁধে ক'রে দৌড়াদৌড়ি করি! জাহান্নমে যাক তোমার সেফ্‌টি-পিন।"

বাহিরে মিহি গলায় বলিলেন, "মেধোকে ডেকে বল না সিন্দুকটা বার ক'রে দিতে; আমার শরীরটা ভাল নেই তেমন।"

নারীকণ্ঠ কিছু উচ্চে উঠিল, "বেলা ছ-টা হয়ে গেল এখনও বিছানায় শুয়ে গা মোড়ামুড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমার খেটে খেটে প্রাণ গেল আর উনি শুধু আরাম করবেন। এসু বলছি শীগ্‌গির বাইরে, নইলে কুরুক্ষেত্র হবে!"

পিতোমবাবু একবার নেপথ্যে পরোলোকগতা মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়া সুড়সুড় করিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভাঁড়ারের সিন্দুকটি নিরামিষ চাল ডাল ও আমিষ ইঁদুর আরশুলায় বেশ পূরা দুই কি আড়াই মণ হইবে। পিতোমবাবু তাহা তুলিতে চেষ্টা

করিয়া, না পারিয়া তাহাতে কাঁধ দিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আন্দোলনে ভীত হইয়া এক[illegible]টি ইঁদুর এক ছিদ্রপথে সিন্দুক হইতে তড়াক করিয়া বাহির হইয়া পিতোমবাবুর গলার উপর অবতীর্ণ
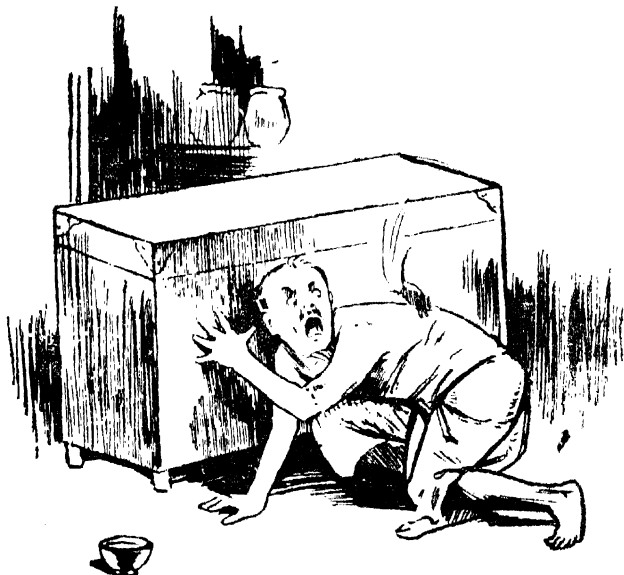
আড়াই মণ সিন্দুকটি কাঁধ দিয়া দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

হইয়া তাঁহার শিরদাঁড়া বাহিয়া নামিয়া গেল। পিতোমবাবু, "আরে, আরে" বলিয়া ইঁদুরটিকে তাড়াইতে গিয়া একটু বেসামাল হইয়া মেঝের উপর গিন্নির রক্ষিত এক বাটি সরিষার তেলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

গিন্নি তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'এক ফোঁটা কাজ করতে এসে অমনি পোয়াখানেক তেল উল্টে বসল! বাবারে বাবা, আমি তো আর পারিনে—সেই কোন্ রাজ্যি থেকে নস্থ খুড়োকে সেধে সেধে ঘানির তেল আনাই; তার হয়ে গেল। বলি, রোজ যে এক গঙ্গা গিলে উজাড় কর, তা যায় কোথায়? একটা কাঠের বাক্স নেড়ে সরাতে গিয়ে যে হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তেলের বাটি উল্টে গোল্লায় গেলে একেবারে!"

পিতোমবাবু, "এ্যাডিং ইন্‌সাল্ট্ টু ইন্‌জুরী" বলিয়া কি-একটা বলিতে গেলেন; তাহাতে উল্টা উৎপত্তি হইল। গিন্নি আবার হাঁকিয়া উঠিলেন, "আরে রেখে দাও তোমার ইন্‌জিরী—ইন্‌জিরী আদালতে ব'ল গিয়ে;—এক পয়সার যার দেহে সামর্থ্য নেই সে আবার ইন্‌জিরী বলে, মুখে আগুন অমন ইন্‌জিরীর!"

পিতোমবাবু অনুযোগের স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আরে বাবা।" কিন্তু কে সে কথা শোনে? গিন্নি আরও খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, "তোমার বাবাকে যা বলতে চাও, তাঁকে গিয়ে বল। আমি কিসে তোমার বাবা হলাম শুনি? এক বাটি তেল উল্টে আবার রস করবার চেষ্টা হচ্ছে! দূর হও এখুনি আমার ভাঁড়ার থেকে, নইলে ঐ বাকি তেলটুকুনও মাথায় ঢেলে দেব বলছি।"

পিতোমবাবু দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সত্য সত্যই কিছু উত্তেজিতা হইয়াছেন। তিনি তাই গেঞ্জির উপর তেলের ছোপটুকুকে পরাজয়ের টীকারূপে বহন করিয়া অক্ষত দেহে অবিলম্বে ভাণ্ডার-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

স্নান করিতে করিতে পিতোমবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কি? স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই যে ব্যবহার, ইহাই কি চিরন্তন? সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, বেহুলা কি তবে পত্নী-সম্মার্জ্জনী-পীড়িত কবির পরিহাস মাত্র? 'পতি পরম গুরু' এ মন্ত্র কি স্ত্রীলোকের মধ্যে স্থান না পাইয়া অবশেষে তাহার চিরুণীতে আশ্রয় লইয়াছে? দেহ-গোদের উপর এ কি নিদারুণ বিষফোঁড়া! পিতোমবাবু নিজ চিন্তার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মাথায় ঘটির পর ঘটি জল ঢালিয়া চলিয়াছেন—চৌবাচ্চা নিঃশেষ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ স্নানাগারের বাহির হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে বলিল, "খুব যে নবাবী ক'রে সব জলটুকু খরচ ক'রে রাগছ—কলে তো জল নেই—আমরা কি সব শালপাতায় গা হাত পা পুঁছে স্নানের কাজ সারব নাকি? রাস্তার কল থেকে চার পাঁচ বাল্তি জল তুলে তবে তুমি আফিস যাবে, বুঝলে?"

পিতোমবাবু আতঙ্কে স্নানের জল ছাপাইয়া ঘামিয়া উঠিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া অন্যমনস্কতার দোহাই দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নির্দ্দয় নারী-হৃদয়ে তাঁহার সে বেদনাপূর্ণ আবেদন "ন্যাকামো" বলিয়া অভিহিত হইল। অগত্যা তিনি বাল্তি হস্তে রাস্তায় জল আনিতে বাহির হইলেন। ভাবিয়াছিলেন মেধোকে উৎকোচ-দানে বশ করিয়া উন্মুক্ত রাজপথে বাল্তি হস্তে বিচরণ করার অপযশ হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবেন। কিন্তু মেধো তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ির পথে "মা ঠাকরুণ ডাকছেন" বলিয়া উপর তলায় উধাও হইয়া গেল। প্রথম দুই বাল্তি জল পিতোমবাবু লোক-চক্ষুর অন্তরালে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। কিন্তু তৃতীয় বাল্তি লইয়া তিনি সবে দরজার গোড়ায় পা দিয়াছেন এমন সময় পিছনে কে "হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ," করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নেপেন ভাদুড়ীকে। নেপেন ভাদুড়ী তাঁহার সহিত এক আফিসে কাজ করে—এবং সময় পাইলেই অবান্তর কথা বলিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করে। এই ভাবে ধরা পড়িয়া পিতোমবাবু লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। নেপেনবাবু বলিলেন, "আরে সাণ্ডেল মশায়, দিন দুপুরে জলচুরি ক'রে কোথায় পালাচ্ছেন?"

পিতোমবাবু কোন উপায়ে আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য বলিলেন, "আর ভাই, চাকর বেটা পালিয়েছে, দুর্দ্দশার পার নেই—বল কেন?"

এমন সময়ে পিছনে কে "হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ" করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নেপেন ভাদুড়ী।

উপরের বারান্দা হইতে ঘন কৃষ্ণ দেহখানি অর্দ্ধেকের অধিক বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেধো চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবু, শীগ্‌গির করুন, মা ঠাকরুণের চানের বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

"হে ধরণী দ্বিধা হও! এ কি নিদারুণ অপমানের আগুনে আমায় পুড়িতে হইল।" পিতোমবাবু এক মিনিটে তিন চার বার রং বদলাইয়া করুণ নেত্রে নেপেনবাবুর দিকে চাহিয়া কোনো কথা না বলিয়া বাল্‌তিটা তুলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। নেপেনের অট্টহাস্যে পথঘাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে ধ্বনি যেখানে পিতোমবাবু স্ত্রীর নিকট এক বাল্‌তি জল কম আনার জন্য জবাবদিহি করিতেছিলেন সেখানেও পৌঁছিল। পিতোমবাবু ক্ষণেকের জন্য কি যেন একট আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "ও আবার কি রকম ঢং করছ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "কিছু না, আফিসের বেলা হয়ে গেছে।"

স্ত্রী বলিলেন, "ঐখানে ভাত বাড়া আছে নিয়ে খেয়ে আফিসে বেরোও। ফেরবার পথে দুটো ডাব কিনে এন—মেধো বললে, তোমাদের আফিসের কাছে পাওয়া যায়।"

দুই হস্তে দুইটি ডাব লইয়া নিজে আফিস হইতে গৃহাভিমুখে যাইতেছেন ও নেপেন ভাদুড়ী তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের নিকট উক্ত ঘটনার সরস ব্যাখ্যা করিতেছে, এই চিত্র অন্তরে অঙ্কিত করিয়া পিতোমবাবু কম্পিত চরণে আফিসের দিকে রওয়ানা হইলেন।

আফিসে ঢুকিয়াই তিনি দেখিলেন, নেপেন ভাদুড়ী জন দশেক ছোকরা-গোছের কর্ম্মচারী পরিব্যাপ্ত হইয়া কি-যেন একটা অভিনয় করিতেছে। পিতোমবাবু বুঝিলেন

যে, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সহিত এ অভিনয়ের খুব নিকট কোন যোগ আছে। তিনি মুখ ফিরাইয়া কোন কল্পিত সরল রেখা অনুসরণ করিয়া সটান নিজের টেবিলে গিয়া বসিলেন। নেপেন ভাদুড়ী যে সকল কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারা একে একে নিজের টেবিলে গিয়া বসিতে লাগিল। কেহ কেহ পিতোমবাবুর টেবিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া, "বাক্ আপ্ পিতোমবাবু" বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া গেল,—যেন পিতোমবাবু তাহাদের নিকট সান্ত্বনার জন্য কখনও আবেদন করিয়াছিলেন। একজন বলিয়া গেল, "ব্রাদার, তোমার শুনছি বড় দুঃসময় চলেছে। আমাদের পাড়ার ভুটানী বাবার একটা মাদুলী জোগাড় ক'রে ধারণ কর না; দেখো অব্যর্থ গ্রহ-শান্তি হবেই হবে—বলব বাবাকে তোমার কথা?"

পিতোমবাবু নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, "না, না, তোমায় অত পরোপকার করতে হবে না।" বলিয়া ব্যস্ততা দেখাইবার জন্য একটা আধমুণে লেজার টান দিতে যাইয়া টেবিলে ও নিজের ধুতিখানার উপর একটা লাল কালির দোয়াত উল্টাইয়া ফেলিলেন। রাগে ক্ষোভে পিতোমবাবু পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। কাপড়ে কালি লাগা দেখিলে সুভাষিণী, অর্থাৎ পিতোমবাবুর গৃহিণী, তাঁহাকে কি যে না বলিয়া লাঞ্ছিত করিবেন তাহা পিতোমবাবু ভাবিতেই পারিলেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থা যখন পল্লীভূমিবিক্রম্ভ কোনও এক আগ্নেয়গিরির ন্যায় ধূমায়িত, কম্পিত ও বিচলিত ঠিক সেই সময় নেপেন ভাদুড়ী আসিয়া পিতোমবাবুর মুখ নিতে হাত দিয়া গাহিয়া উঠিল—

ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত-ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেট পিতোমবাবু, উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আফিসের ছোট সাহেব নামিয়া আসিলেন।

"দাদারে আমার,
দরগায় লাগাও সিন্নি,
পীরের কৃপায় হবেন গিন্নি
তোমা পরে সদয়া···ভাইরে সদয়া আ আ... ।"

পিতোমবাবু বহু বর্ষের অনভ্যাস ভুলিয়া হঠাৎ পম্পিয়াই-বিধ্বংসী ভিসুভিয়সের মত সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। একবার "দি লাষ্ট ষ্ট্র" বলিয়া সিংহনাদ করিয়াই পিতোমবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলের নীচ হইতে ওয়েষ্ট্ পেপার বাস্কেটটা তুলিয়া লইয়া নেপেন ভাতুড়ীকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। নেপেন আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। পিতোমবাবু তাহার পশ্চাতে "রাস্কেল, রাস্কেল" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া সিঁড়ির নিকট তাহাকে চাপিয়া ফেলিলেন। ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত-ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেটটা পিতোমবাবু উদ্যত-বজ্র ইন্দ্রের ন্যায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আফিসের ছোট সাহেব নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মেম সাহেব সেদিন তাঁহাকে গলদা চিংড়ির সহিত তুলনা করিয়া কি বলাতে তাঁহার চিত্ত কথঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত ছিল। সম্মুখে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভীষণ চটিয়া গেলেন ও বড়বাবুকে ডাকিয়া নেপেন ভাতুড়ীর পাঁচ টাকা ও পিতোমবাবুর দশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতোমবাবু অনেক করিয়া সাধ্য সাধনা করা সত্ত্বেও সাহেবের কঠিন প্রাণে দাগমাত্র পড়িল না।

২

জরিমানার কথাটা পিতোমবাবু গিন্নির কাছে অনেক দিন ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মাসান্তে সুভাষিণী যখন তাঁহার নিকট হইতে বেতনের টাকা গুণিয়া লইতেছিলেন তখন টাকা কম দেখিয়া পিতোমবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "এ কি ? দশ টাকা কম কেন ?

পিতোমবাবু, "আমি এই কি না···" বলিয়া কি একটা বলিতে গিয়া [illegible] পথে ঢোক গিলিয়া বিষম খাইয়া বসিলেন। তিনি পুনর্ব্বার স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলে পর গিন্নি আবার তাড়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সত্যি কথা ব'ল বলছি, নইলে অনর্থ হবে ! রেস খেলেছ ? বাজি হেরেছ ? কি করেছ ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না জরিমানা দিয়েছি। সেদিন কি রকম মাথাটা গরম হয়ে উঠল······"

"তাই কি রাস্তায় মারপিট করেছিলে ? ওমা কি হবে গো ! বুড়ো বয়সে শেষ কালে মারামারি ক'রে থানা পুলিস করলে ! ওগো মাগো, আমায় কিনা এও শুনতে হ'ল !"

পিতোমবাবু যতই বলেন, "আরে না না, থানা নয়, পুলিস নয়, আফিসে···" গিন্নির ততই শোক বাড়িয়া চলে, "ওগো তুমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে শেষ কালে—মুখে চূণ কালি মাখলে, আমার এ কি লজ্জা হ'ল।"

এমন সময় নস্থ খুড়া আসিয়া পড়ায় গিন্নি পিতোমকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের কাছে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও নস্থ খুড়ো, বুড়ো বয়সে মারপিট···"

নস্থ খুড়ো গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ইস্টুপিড, পাষণ্ড কোথাকার, তুমি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোল!"

পিতোমবাবু দেখিলেন তিনি ক্রমে গভীর হইতে অতল জলে গিয়া পড়িতেছেন। তিনি এবার প্রাণপণ করিয়া গিন্নির কান্না খুড়ার গর্জ্জন সব ডুবাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পুলিসেও যাইনি সুভাষিণীকেও মারিনি। ন্যাপা ভাদুড়ীকে সিঁড়ির মোড়ে চেপে ধ'রেছিলাম ব'লে সাহেব জরিমানা করেছে।"

গিন্নি বলিলেন, "ও, আফিসে গিয়ে বুঝি ঐ সবই করা হয়?"

নস্থ খুড়া বলিলেন, "তা আগে বলনি কেন?"

সুভাষিণী এতক্ষণ পুলিস-সংক্রান্ত কলঙ্ক-ভীতি হইতে সামলাইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি এখন ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেছোকরাদের মত ধস্তাধস্তি করতে তোমাদের একটু ঘেন্নাও কি হয় না? দশ দশটা টাকা। এখন কি তোমার বাঁদুরেপনার জন্যে খোকার দুধ বন্ধ করব, না, সকলে নিরিমিষ খেয়ে দিন কাটাব?"

নস্থ খুড়া বিচারকার্য্যনিরত সলোমনের ন্যায় মুখ করিয়া বলিলেন, "না না, শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করা কদাপি উচিত হইবে না। তদ্ব্যতীত, পীতাম্বর অনবধানতাবশত যে অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার উচিত হইবে আগামী এক মাস কাল ট্রামে আফিস যাতায়াত না করিয়া পদব্রজে গমনাগমন করা।"

সুভাষিণী অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া আনন্দে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, নস্থ খুড়ো! হেঁটে হেঁটে আফিসে যেতে হ'লে, ওনার রসের কেঁড়ে একটুখানি হাল্কা হয়ে আসবে—ছেবলামী করাও একটু বন্ধ হবে।"

পিতোমবাবু নস্থ খুড়ার দিকে একবার বিষনেত্রে তাকাইলেন; কিছু বলিলেন না। সুভাষিণী খুড়া মহাশয়ের রায়ে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি খুশী মনে স্বামীকে বলিলেন, "তুমি যাও তো গো ছ-পয়সার কচুরী নিয়ে এসগে। মেধো খোকাকে খেলা দিচ্ছে। নস্থ খুড়ো একটু ব'সে চা-টা খেয়ে যাও।"

নস্থ খুড়া একটা নিকেলের ডিবা বাহির করিয়া তাহা হইতে এক টিপ তীব্রগন্ধ নস্য গ্রহণ করিয়া একটি মাসাধিককাল রজকদর্শন-বঞ্চিত রুমালে নাক মুখ মুছিয়া বলিলেন,

"বিলক্ষণ, তা তোমরা যদি বল, তাহা হইলে কি আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি ?"

পিতোমবাবু ছয়টি পয়সা হস্তে লইয়া খাবারের দোকানে কচুরী আনিতে চলিলেন। মনে হইল কচুরী না হইয়া যদি নস্যু খুড়ার জন্য বিষ আনিবার জন্য এ যাত্রা হইত তাহা হইলেতাঁহার অন্তরে অন্তত কিছু সুখের সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তি পুরুষ হইয়া উৎপীড়িত পুরুষের বেদনা বুঝে না, বরং তাহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিষই, কচুরী নহে। হঠাৎ মনে হইল কচুরী খাইয়াও তো কেহ কেহ কলেরা হইয়া মারা যায়—নস্যু খুড়াকেও বাসী দেখিয়া কচুরী খাওয়াইতে পারিলে তাঁহারও হয়তো একটা ভালমন্দ ঘটিতে পারে। দোকানে পৌছাইয়া পিতোমবাবু বলিলেন, "বেশ ভাল রকম বাসী কচুরী আছে ?"

দোকানদার অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; বলিল, "সে কি মশাই—বাসী কচুরী কি আবার কেউ বিক্রি করে নাকি ?" যেন কলিকাতার ময়রার অভিধানে বাসী বলিয়া কোন শব্দই নাই।

পিতোমবাবু বলিলেন, "আরে বাপু, কুকুরকে খাওয়াতে হবে—সস্তা টস্তা ক'রে দাও না থাকে তো।" ময়রা অগত্যা, যেন খুবই অনিচ্ছার সহিত, তাঁহাকে এক ঠোঙা কচুরী বাহির করিয়া দিল। পিতোমবাবু সানন্দে কচুরী লইয়া গৃহে চলিলেন। মনে মনে বলিলেন, "কলেরা না হোক অন্তত দু চার দিনের জন্য ঘর থেকে বেরন বন্ধ হবে তো!"

একখানা কচুরী মুখে দিয়াই নস্যু খুড়া বলিলেন, "থুঃ, থুঃ, ছ্যা, ছ্যা, এই কি অদ্যকার কচুরী না কি ? বাবাজি, তোমাকে ময়রা ঠকাইয়াছে। এ কচুরী নিদেন পক্ষে তিন দিবসের বাসী মাল।"

গিন্নি বলিলেন, "বলি, তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে দোকানে গিয়েছিলে নাকি ? যাও শীগ্‌গির খাবারটা বদলে নিয়ে এস। এদিকে চায়ের জল ফুটে উঠল; কোনও কাজ কি তোমায় দিয়ে হবে না ?"

পিতোমবাবু নিজের সযত্নকল্পিত প্রতিহিংসার পথ এমন করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া মরিয়া হইয়া বলিলেন, "না, না, ও কিছু তেমন বাসী নয়; হাল .রম না হ'লেই কি খাবার বাসী হয়; খান না, খুড়ো মশায়; কিছু হবে না।"

খুড়া শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "না বাবাজি, আমার আর বাসী খাইবার বয়স নাই।"

গিন্নি হাঁকিলেন, "শী···গ্‌গি···র যাও বলছি। নইলে তোমায় রাত্রে ভাতের বদলে ঐ কচুরী খেয়েই থাকতে হবে।"

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া পুনর্ব্বার ঠোঙা হস্তে পথে বাহির হইলেন। মুখখানা তাঁহার হস্তস্থিত বাসী কচুরী অপেক্ষাও শুষ্ক, ম্লান।

৩

ট্রামের পয়সা না পাওয়াতে আজকাল পিতোমবাবু আফিসে প্রায়ই 'লেট' হইতে আরম্ভ করিলেন। বড়বাবু তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, একথা সাহেবের কানে গেলে মুস্কিল হইবে। পিতোমবাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, কোন ঘোর বিপদে পড়িয়া তাঁহার বর্ত্তমানে ট্রামে যাতায়াত করিবার সংস্থান নাই—কি করিবেন ? বড়বাবু বলিলেন, যেমন করিয়া হউক আফিসে সময়ে না পৌঁছাইলে বিপদ অনিবার্য্য।

পিতোমবাবু গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আফিসে 'লেটে' পৌঁছানতে বড়বাবু শাসিয়েছেন 'রিপোর্ট' করবেন, বুঝলে ?"

গিন্নি বলিলেন, "কেন, পথে কি খেলা ক'র নাকি ? দেরী হয় কেন ?"

"সকালে বাজার ক'রে, তোমার ফুট-ফরমাস খেটে, ভাত খেতে দেরী হয়, তার পর যদি ট্রামের পয়সা না পাই তা হ'লে 'পাংচুয়াল' হ'তে হ'লে আফিসে দৌড়ে যেতে হয়।"

সুভাষিণী বিষকণ্ঠে উপদেশ দিলেন, "তবে এ ক'টা দিন দৌড়েই যেও।"

হতাশা ও গত্যন্তরবিহীনতা পিতোমবাবুকে পাগলের মত করিয়া তুলিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না, ট্রামেই যাব, আল্‌বৎ যাব !"

গিন্নি আরও জোরে বলিলেন, "অমন ক'রে জানোয়ারের মত চেঁচাচ্ছ কেন ? মারবে না কি ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "হাঁ। মারব, যদি ফের আমার কথার উপর কথা বল তো মারই খাবে।"

গিন্নি বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়া দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি আজ নিশ্চয় মদ খেয়ে এসেছ। তা নইলে আমায় মারতে ওঠ ! থাক আজ ঐ ঘরে বন্ধ হয়ে, আজ তোমার খাওয়া-দাওয়া বাদ ; নেশা ছুটলে পর আমার কাছে মাপ চাইবে, তবে তোমায় আমি ছাড়ব। ঝাঁটা মার অমন পুরুষমানুষের মুখে ! চামারের মত কথা শোন একবার ; বলে কি না মারবে ! ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

পিতোমবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খোল বলছি দরজা, তা নইলে লাথি মেরে ভেঙে ফেলব।"

"ভাঙ না ক্ষেমতা থাকে তো। তার পর বাড়ীওলাকে গুণগার দিও।"

পিতোমবাবু দড়াম করিয়া দরজায় একটা লাথি মারিলেন। পায়ে লাগিল বটে, তবে দরজার কিছুই হইল না। ডাকিলেন, "মেধো, মেধো !" শুনিলেন গিন্নি বলিতেছেন, "মেধো, ওদিকে যাস যদি তো ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।"

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। আফিস হইতে ফিরিয়া কিছু খাওয়া হয় নাই; কি করিবেন? একখানা 'প্রবাসী' পড়িয়াছিল তুলিয়া লইলেন। প্রথমে চোখে পড়িল একটি প্রবন্ধ, 'নরনারীর সমান অধিকার।' পিতোমবাবু ভাবিলেন, "হায়রে, সে রকম সুদিন কি আমাদের কখনও হবে?"

তিন চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও সুভাষিণীর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। একবার তোপসে মাছ ভাজার একটা উগ্রমধুর গন্ধ দমকা হাওয়ার সহিত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পিতোমবাবুর রসনায় বান ডাকাইয়া দিয়া আবার মিলাইয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওগো, লক্ষ্মীটি, দরজা খোল, খিদেয় প্রাণ গেল, আমি দৌড়েই আফিস যাব, দরজা খোল।" শুনিলেন ভর্জ্জিতমৎস্যজড়িত জিহ্বায় নস্থ খুড়া সুভাষিণীকে বলিতেছেন, "না, না, খুলিয়া কাজ নাই। মাতাল মানুষ পুনরায় যদি প্রহার আরম্ভ করে, আমি এ বয়সে রোধ করিতে পারিব না।"

দরজা বন্ধই রহিল। পিতোমবাবু 'প্রবাসীর' গল্প ও প্রবন্ধ শেষ করিয়া বিজ্ঞাপন-গুলি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একখানা ছবি। একজন লোক আদেশ করিবার ন্যায় ভঙ্গিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান। চক্ষু দিয়া তাহার অপূর্ব্ব জ্যোতি নিঃসারিত হইতেছে। তাহার সম্মুখে দলে দলে লোক—কেহ করজোড়ে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া, কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণত। এক পার্শ্বে গুটিকয়েক হস্তী ও অশ্ব উক্তরূপে আত্মসমর্পণ-মুদ্রায় উপস্থিত রহিয়াছে। ছবিটির নীচে বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

অদ্ভুত ইচ্ছা-শক্তি

পথহারা চলৎশক্তিরহিতপ্রায় পথিক মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ ওয়েসিস্ দেখিতে পাইলে যেমন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে পুনর্জ্জন্মের আশ্বাস পাইয়া পুনর্ব্বার চাঙ্গা হইয়া উঠে, পিতোমবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া তেমনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, বন্দীদশা, নস্থ খুড়া, তোপসে মাছ সব ভুলিয়া আধভাঙা বেতের চৈয়ারখানার উপর যতটা পারেন সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার অন্তরে যেন কোটি বিহঙ্গম কোনো এক নূতন উষার আশা-সূর্য্যের পানে চাহিয়া গাহিয়া উঠিল, "আর ভয় নাই; দুখ হ'ল অবসান।"

পিতোমবাবু পাঠ করিলেন—

অদ্ভুত ইচ্ছা-শক্তি

"ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে মানুষ কি' না করিতে পারে? পৃথিবীতে এই যে এত বিফলতার ক্রন্দন, এত উৎপীড়িতের ব্যাকুল আর্ত্তনাদ, ইহার মূলে রহিয়াছে ইচ্ছাশক্তির [illegible] বা অশিক্ষিত ভাব। শিক্ষিত ইচ্ছা-শক্তি মানুষকে তেমনি করিয়াই ক্ষমতাশালী ও অভাব[illegible]নের উপর প্রভাবাপন্ন করিয়া তোলে যেমন করিয়া শিক্ষিত মাংসপেশী কুস্তিগির বা অপরের মা[illegible]শক্তরে অপরের উপর শারীরিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।" আমাদের যুযুৎসু-যোদ্ধা অ[illegible]পনি বর্ত্তমানে যতই পরনির্ভরশীল, কাপুরুষ ও অপরের উপর শিক্ষা অনুসারে চলিলে আ[illegible]

প্রভাবহীন হউন না কেন, তিন মাসের ভিতর আপনার কথায় লোকে উঠিবে বসিবে, আপনার চোখের চাহনির সম্মুখে উদ্যত-ছোরা গুণ্ডাও হটিয়া যাইবে, অদম্য আত্মনির্ভরশীলতা আপনাকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসীন করিয়া দিবে।

"এ শক্তি লাভের জন্য আপনাকে কিছু খাইতে হইবে না, কিছু ধারণ করিতে হইবে না। নিছক মানসিক শক্তির উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা আপনি দিনে দিনে অধিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন।

"এ শক্তি আপনার ভিতরেই আছে। আমরা মাত্র তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিব।

"নীচের ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রীপ্রভাবানন্দ স্বামী
পোষ্ট বক্স ০৩১৩, কলিকাতা।"

পিতোমবাবু ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য; আর আমি একটা সামান্য নারীর দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে কি করব তা ভেবে কূল পাচ্ছি না! কালই আমি স্বামীজিকে চিঠি লিখে সব ঠিক ক'রে ফেলব।"

গভীর রাত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া সুভাষিণী দেখিলেন, তাঁহার স্বামী অঘোরে নিদ্রা দিতেছেন। মুখ তাঁহার কি একটা বিজয়ানন্দের আলোকে উদ্ভাসিত। সুভাষিণী মনে মনে বলিলেন, "মদের এমনই গুণ বটে! পেটে ভাত পড়েনি একটাও, ঘুমের ঘোরে মুখ করেছে যেন ওকে কে লাটের গদিতে বসিয়ে দিয়েছে।"

৪

প্রভাবানন্দ পিতোমবাবুকে লিখিলেন—

"আপনি যে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে আমি সংপ্রশংস সম্ভাষণ করিতেছি। আপনি এই পত্র লিখার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিলাভের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

"এখন আপনাকে বলি, ইচ্ছা-শক্তি কি। আমরা যখন সজ্ঞানে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করি বা কোনরূপ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করি তখন একথা আমরা কদাচ মনে করি না যে, আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে কোন কিছু আছে যাহার উপর আমাদের কার্য্য বা ইচ্ছা কোনরূপে নির্ভর করে। বস্তুত আমাদের যে মন তাঁহার মধ্যে সজ্ঞানতার ক্ষেত্র অতিশয়ই স্বল্প-পরিসর। আমাদের যে অনভিব্যক্ত অননুভূত মনঃক্ষেত্র তাহা সর্ব্বদাই আমাদের সজ্ঞান চিন্তা ও কার্য্যকে নানা ভাবে প্রভাবিত করিতেছে। যে ব্যক্তি বহুকাল

কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোন এক প্রকার মনোভাব পোষণ করিয়াছে সে যদি কখনও জোর করিয়া তাহার বিপরীত কিছু করিতে যায়, তাহা হইলে সজ্ঞানতার ক্ষেত্রে তাহার ঐরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে তাহা করিতে পারিবে না; কারণ তাহার মনঃক্ষেত্রের প্রত্যেক আপাত অনমুভূত প্রান্ত হইতে সে বিপরীত দিকে আকর্ষিত হইবে। এই জন্য সজ্ঞানে কোনও প্রকার কার্য্য চিন্তা বা ব্যবহার উত্তমরূপে করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের সমগ্র মনঃক্ষেত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

"আপনি যদি অপরের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অক্ষম হন, তাহার কারণ এই যে, আপনি আজন্ম সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে এই ধারণাই মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন যে, আপনি অপর হইতে অধম। এ মনোভাব আপনাকে দূর করিতে হইবে।

* * *

"আপনি পত্রোত্তরে ১৩॥০ টাকা আমায় পাঠাইলে আপনাকে আমি মৎলিখিত পুস্তক 'অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি' পাঠাইয়া দিব। পুস্তকানুগত নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিলেই আপনি ক্রমে ক্রমে প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীকে পদতলে আনিতে পারিবেন।"

পিতোমবাবু অবিলম্বে নিজের ঘড়িটি বন্ধক দিয়া পনের টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বামী প্রভাবানন্দকে পাঠাইয়া দিলেন। 'অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি' আসিল। ছাদের ঘরে লুকাইয়া বসিয়া পুস্তকের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া পিতোমবাবু বুঝিলেন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি আছে অনেক, কিন্তু তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই ছত্রভঙ্গ ইচ্ছাশক্তি একত্র করিতে হইলে তাঁহাকে কোন কঠিন কার্য্য প্রত্যহ একাগ্রমনে কিয়ৎকাল ধরিয়া করিতে হইবে। যথা সুতার জট ছাড়ান। অনেকটা সুতা জট পাকাইয়া তাহা এক মনে খুলিতে থাকিলে বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তি শীঘ্রই ঐ জটের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। পিতোমবাবু গিন্নির 'ক্রোশের' সুতার বাণ্ডিল একটি অপহরণ করিয়া ছাদের ঘরে লইয়া খুলিয়া জট পাকাইয়া ফেলিলেন। তার পর জট ছাড়াইবার পালা। পিতোমবাবু যতই এক দিক খুলেন উহা ততই অপর দিকে দ্বিগুণ জট পাকাইয়া যায়। তিন দিন ধরিয়া পিতোমবাবু তাঁহার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তির কণাগুলি একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিলেন সুতায় যে জট সেই জট।

গিন্নি তাঁহাকে ঘন ঘন ছাদের ঘরে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশে পাশে সব গেরস্ত মানুষের বাড়ী; বৌ-ঝিরা ছাদে বড়ি দিতে, চুল শুকুতে ওঠে; তুমি ছাদে কিসের জন্য ঘোরাঘুরি কর, বল তো?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না ঘোরাঘুরি তো করি না; এই একটু বিশ্রাম হয়।"

সন্দিগ্ধচিত্ত গৃহিণী সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া এক দিন হঠাৎ যখন স্বামী এক মনে সুতার জট খুলিতে ব্যস্ত, সেই সময় ছাদে গিন্নী উপস্থিত হইলেন। রাশিকৃত সুতা

দেখিয়া তো তাঁহার চক্ষুস্থির। তিনি বলিলেন, "ওমা, বুড়ো বয়সে তুমি কি শেষে ঘুড়ি উড়ুতে আরম্ভ করলে না কি? ছি, ছি, লোকে বলবে কি? খবরদার আর তুমি ছাদে উঠে এ সব করবে!"

স্বামী বলিলেন, "ঘুড়ি আবার কোথায় ওড়াই; একি ঘুড়ির সুতো?"

"তাইতো এ দেখছি আমার বুনবার সুতো! এ তুমি কোথায় পেলে? আমি ব'লে সুতো নেই দেখে খোকাকে মারধোর করলাম, মেধোকে কত গাল দিলাম। দেখ দিখিন আর তুমি সুতোটুকু নিয়ে এখানে খেলা করছ। ওমা কি ঘেন্না, তুমি ফের যদি আমার সুতোয় হাত দেবে তো দেখতে পাবে।" বলিয়া তিনি জট-পাকান সুতার রাশি লইয়া চলিয়া গেলেন।

পিতোমবাবু অতঃপর আফিসে অবসর সময় টোয়াইন সুতা জট পাকাইয়া ও খুলিয়া দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পাঠ শেষ করিলেন।

৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'আমি'।

স্বামীজি লিখিয়াছেন, "আমি কে? আমি সব: আমি সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু, আমি পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমি সংহারক মহেশ্বর। আমার মধ্যেই সৃষ্টি, আমিই সৃষ্টি, আমিই স্রষ্টা। আমি ছাড়া আর কিছু নাই।"

দ্বিতীয় পাঠের উদ্দেশ্য ছাত্রকে নিজের উপর বিশ্বাসবান করা। উপায় প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে ১০০ হইতে ১০০০ বার 'আমি মাহাত্ম্য'-সূচক কোন মন্ত্র জপ করা। ইহাতে সজ্ঞানে অজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে মানসক্ষেত্র আত্মবিশ্বাস-বারিতে সিক্ত সরস হইয়া উঠে।

প্রথম সাত দিন পিতোমবাবু জপ করিলেন, "আমি বেলুন অপেক্ষা উর্দ্ধগামী, নায়েগারা অপেক্ষা প্রবল, সমুদ্র অপেক্ষা বিশাল ও গভীর, হিমালয় অপেক্ষা উচ্চ, তুষার হইতে শুভ্র, সূর্য্য হইতে প্রখর; আমি সর্ব্বাপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

তার পর পনের দিন তিনি মনে মনে পৃথিবীর সকল বস্তু ও মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমা অপেক্ষা তুমি বহু নিম্নে। হে জলধর, হে পর্ব্বত, হে বৃক্ষ, আমা অপেক্ষা তোমরা ক্ষুদ্র। হে স্যাণ্ডো, হে হাকেনস্মিট, হে গামা ও ইমাম-বক্স, তোমরা আমা হইতে বহু দুর্ব্বল। হে নেপোলিয়ান, তোমা হইতে আমি বড় যোদ্ধা; চাণক্য, আমি তোমাপেক্ষা বিচক্ষণতর রাজনীতিবিদ্; কালিদাস, তোমা হইতেও

আমি বড় কবি ; সেক্সপীর, তোমা হইতেও আমি বড় নাট্যকার। হে ধরণীর অধিবাসী, তোমরা আমার পদে প্রণত হও।"

এইরূপে পিতোমবাবু বহু অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া অবশেষে সেই পাঠে আসিলেন, যাহাতে কি করিয়া অপরকে নিজ ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করান যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমত, যে ব্যক্তিকে বশ করিতে হইবে তাহার অলক্ষিতে তাহার ঘাড়ের ঠিক মধ্য দেশে এককালীন পাঁচ দশ মিনিট কাল এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইবে ও মনে মনে বলিতে হইবে, "তুমি আমার দাস (বা দাসী), তুমি আমার কথামত কাজ করিবে,—অন্যথা করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন, আমার আজ্ঞাবহ ; তোমার নিজের বলিয়া কোন ইচ্ছা নাই।" তৎপরে (কয়েক দিবস এইরূপ করিবার পরে) এক দিন তাহার চোখে চোখে চাহিয়া তাহাকে ধীর শান্ত কণ্ঠে, সকল তীব্রতাবৰ্জ্জিত ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার পক্ষে তাঁহার আদেশ মত কার্য্য না করা স্বভাবতই অসম্ভব। ইহার পর তাহাকে যাহা বলা যাইবে সে তাহাই করিবে।

পিতোমবাবু দিন পনের আড়ালে আড়ালে সুভাষিণী ও মেধোর ঘাড়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহাদের দাসত্বে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তার পর এক দিন তিনি মেধোকে সিঁড়ির নিকট ধরিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "হে মাধব, আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার দাস। পরমপিতা ভগবান তোমাকে আমাপেক্ষা নিম্নাসন অলঙ্কৃত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব হে মাধব, তুমি তোমার ভাগ্যনিয়ন্তার নির্দ্দেশ অনুসরণ কর। এই পাদুকা-যুগল বহন করিয়া তুমি আমার কক্ষে স্থাপন কর।"

মেধো বাবুর কথা একটাও বুঝিতে না পারিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাবু বুঝিলেন, মেধোর ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে ও সে তাঁহারই ইচ্ছায় এখন নড়িবে চড়িবে। তিনি আবার বলিলেন, "মাধব।" মেধো এবার সত্যই ভয় পাইয়া বলিল, "আজ্ঞে বাবু কি বলছেন ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "জুতোজোড়া নিয়ে ঘরে রেখে এস।"

মেধো তাঁহার পা হইতে জুতোজোড়া খুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিল ; তাহার পশ্চাতে পিতোমবাবু বিজয়োল্লাস-গর্ব্বিত বদনে বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইলেন।

গিন্নি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি জুতা হস্তে ভৃত্য ও তৎপশ্চাতে খালি পায়ে বাবুর এই অপরূপ মিছিল দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তার পরে পিতোমবাবুকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ?"

পিতোমবাবু গৃহিণীর মুখে এরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, সময় হইয়াছে। এইবার তাঁহার আত্মপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। তিনি মেধোর হস্ত হইতে চটিজোড়া

লইয়া পায়ে দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "রে নারী, সৃষ্টিতে তোমার স্থান কোথায় তাহা বুঝিয়াছ কি? তাহা আমার পদতলে। আইস আপন প্রকৃতিদত্ত স্থান পূর্ণ কর।

পিতোমবাবু—রে নারী, সৃষ্টিতে তোমার স্থান……
সুভাষিণী—আ মরণ,……

অন্যথা হইবার নহে, তুমি আমার দাসী; আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার জীবনের সার্থকতা।"

সুভাষিণী প্রথম একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল স্বামী সম্ভবত কোন অ্যামেচার থিয়েটারের পালায় নামিয়াছেন, এ তাহারই রিহার্সাল হইতেছে। তাঁহার মেজাজটাও আজ একটু ভালই ছিল, তাই তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আ মরণ, রস করবার ইচ্ছে তো সঙ্গে চাকর বাকর নিয়ে বেরিয়েছ কেন? চল ঐ ঘরে তোমার পালা শুনিগে।"

পিতোমবাবু বলিলেন, "প্রিয়ে, এ যে-সে অভিনয় নহে। ইহা জীবন-নাট্য। তুমি আমার দাসী—চিরকালের—আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার পূর্ণতা ও স্থিতি।"

গিন্নি নিজের ভুল বুঝিলেন। বলিলেন, "ও, তাই না কি? আচ্ছা! দেখা যাবে কে কার মুনিব।"

পিতোমবাবু একটা ঘরের দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'যাও।"

গিন্নি বলিলেন, "তুমি যাও না।"

পিতোমবাবু হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যাও বলছি এক্ষুনি।"

গিন্নি ভাবিলেন, হয়তো স্বামী আবার নেশাটেশা করিয়াছেন তাই আত্মরক্ষার্থে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন ও ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিলেন।

একাধারে এরূপ দুইটি জয়ের আনন্দে পিতোমবাবু বিভোর হইয়া ছাদে গিয়া পাইচারি করিতে লাগিলেন। ঘণ্টা খানেক পরে আফিসের কাপড় পরিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বার বন্ধ। বহু চীৎকার করিলেন, বহু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা বাসার কাপড়ে ও বাজারের খাবার খাইয়া পিতোমবাবু আফিসে গেলেন। জয়ের মধ্যেও পরাজয়ের ভেজাল পাইয়া আনন্দটা তাঁহার কিছু কমিয়া গেল।

বৈকালে গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন বাড়ীতে কেহ নাই, শুধু মেধো। সে একটা তালা ও চাবি তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ বাপের বাড়ী গেছেন, আমায় ছুটি দিয়েছেন, আমি চললুম।"

পিতোমবাবু বলিলেন, "সে কি? আর খাওয়া-দাওয়া, তার কি ব্যবস্থা?"

মেধো বলিল, "বাড়ীতে চাল-ডাল-নুন-তেল কিছুই নেই; মা ঠাকরুণ টাকা পয়সাও কিছু দিয়ে যাননি।"

পিতোমবাবু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন মাত্র সাড়ে তিন আনা পয়সা আছে। তিনি মেধোকে বলিলেন, "তুমি যাও।" মেধো চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া পিতোমবাবু দেখিলেন, ঘরে বাক্সপ্যাটরা কিছুই নাই—মায় বিছানাপত্র আয়না চিরুণী সব লইয়া গিন্নি শুধু ঘরে খালি তক্তপোষটা ও একখানা চেয়ার মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভাঁড়ারে ঢুকিয়া দেখিলেন একটা টিনে কয়েকটা আদা আর শুকনো লঙ্কা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে এক ঝুড়ি ঘুঁটে। পিতোমবাবু হতাশ হইয়া সাড়ে তিন আনা পয়সা-পকেটে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় ঠাকুর-পুকুর; ট্রামে ও গাড়ীতে অনেক মাইল ও অনেক পয়সার মামলা। দারুণ ক্ষুধা, ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই পয়সা ক'টা ফুরাইয়া গেল, তার পর পিতোমবাবু যূথভ্রষ্ট কোন উষ্ট্রের ন্যায় শ্বশুরালয়ের পথে দেহটাকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পথে বহুবার বিশ্রামের জন্য ও জল খাইবার জন্য বসিয়া ও শেষের দিকে একটা আলু-বোঝাই গরুর গাড়ীর চালকের কৃপায় তাহার উপর চড়িয়া রাত্রি দুইটার সময়

পিতোমবাবু শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। স্বয়ং শ্বশুরমহাশয় তাঁহাকে দরজা খুলিয়া আলো ধরিয়া শয়নাগারের দিকে আগাইয়া দিলেন। শুধু একবার তিনি অনুযোগের সুরে বলিলেন, "ছিঃ বাবাজি, অন্তত ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েও তোমার ওসব নেশা-টেশা করা উচিত নয়।"

পিতোমবাবু ক্লান্তি ও অবসাদের তাড়নায় তাঁহার কথার প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না। মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বহিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "কি গো মুনিব ঠাকুর, এসেছ? বলি হেঁটে হেঁটে তো পায়ের নড়া খইয়ে এসেছ—এখনও কি আমি তোমার দাসী বাঁদী?" পিতোমবাবু সকল ইচ্ছাশক্তি পত্নীর পদে বিসর্জ্জন দিয়া বলিলেন, "না গো না; আর কখনও অমন কথা আমি মুখে আনব না। ঘরে কিছু খাবার আছে?"

৬

পিতোমবাবু 'অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি' গ্রন্থটি রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া আজ কাল আবার ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রীর কথামত ঘুম হইতে উঠেন, বাজারে যান, ছেলেকে খেলা দেন, আফিস যান, মাহিনা আনিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দেন, উঠেন বসেন। কিন্তু প্রাণে তাঁহার দারুণ অশান্তি। গিন্নি তাঁহাকে বড়ই কড়া শাসনে রাখেন, তাঁহার সিগারেট খাওয়া বারণ—সান্ধ্যভ্রমণের জন্য এক ঘণ্টার অধিক বাহিরে থাকা বারণ—কোন প্রকার বদহজমের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মুখ-রোচক খাদ্য খাওয়া বারণ—বন্ধু-বান্ধবকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা বারণ—আরও কত কিছু বারণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে মেধোর, খোকার, নসু খুড়ার, আরও কত লোকের মন জোগাইয়া চলিতে হয়,—প্রত্যহ শত বার শুনিতে হয় তিনি অকর্ম্মা, নির্লজ্জ, বেহায়া ও নির্ব্বোধ।

মরিয়া হইয়া শেষাবধি পিতোমবাবু একদিন পরম শত্রু নেপেন ভাদুড়ীর শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন, "ভাই নেপেন, জানইতো ভাই, আমার কেমন ক'রে দিন কাটছে। কি ক'রে, ভাই, বাড়ীতে একটু নিজের মত সুখে শান্তিতে থাকতে পারি তার একটা উপায় বলতে পার? তুমি বুদ্ধিমান লোক, ইচ্ছে করলে পারবে একটা উপায় ব'লে দিতে।"

নেপেনবাবু তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিয়া অবশেষে একটা পরামর্শ দিলেন।

দিন কয়েক পরে এক দিন রাত্রে তরকারিতে নুন বেশী হইয়াছে বলায় সুভাষিণী পিতোমবাবুর পাতে এক হাতা গরম জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "এবার খাও কম নুন লাগবে এখন। কাজ নেই কোনো, শুধু খুঁত-ধরা বাই হয়েছে। এর পর তুমি হোটেলে গিয়ে চার গণ্ডা পয়সা দিয়ে ভাত খেও।"

পিতোমবাবু রাগ করিয়া না খাইয়া উঠিয়া গেলেন। খাবার ঘরের বাহিরে গিয়াই কিন্তু তাঁহার মুখ কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পর দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিতেই সুভাষিণী দেখিলেন পিতোমবাবু মশারির দিকে পা তুলিয়া, "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন। প্রথমে তিনি তর্জ্জন, গর্জ্জন, গালিগালাজ দিয়া দেখিলেন কিছুই হইল না। পিতোমবাবু তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া এক বিরাটাকৃতি দৈত্য-শিশুর ন্যায় হাত পা ছুঁড়িয়া ক্রমাগত "ম্যা ম্যা" করিতে লাগিলেন। গিন্নি ভয় পাইয়া নস্থ খুড়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

খুড়া আসিয়া টানাটানি করিয়া পিতোমবাবুকে মেঝেতে নামাইয়া দিতেই পিতোমবাবু হামা দিয়া ঘরময় "দুদু কাব ; দুদু কাব," বলিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

গিন্নি এবার সত্য সত্যই ভয় পাইয়া মহা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন। নস্থ খুড়া দৌড়াইয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার এরূপ ব্যায়রাম কখনও দেখেন নাই। তিনি নিজ অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য বলিলেন, "অ্যাকিউট নার্‌ভাস ব্রেক-ডাউন, রোগীকে কোন প্রকার নাড়া চাড়া বা উত্তেজিত করিবে না। দুধ চাহিতেছে, দুধ খাওয়াইয়াই রাখ। পরে আসিয়া দেখিব, কি হয়।"

সকলে ধরাধরি করিয়া পিতোমবাবুকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিলেন। তিনি শুইয়া শুইয়া কখন হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন কখন বা "গ, গ, গ, গ," বলিয়া চীৎকার বা অযথা হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশুরা যেমন ক্রমাগত চিৎ হইতে উবুড়, উবুড় হইতে চিৎ হইয়া দৈহিক 'এনার্জির' সদ্ব্যবহার করে, পিতোমবাবুও সেইরূপে ব্যায়ামের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। একবার নস্থ খুড়া অনবধানতাবশত পিতোমবাবুর পায়ের কাছে আসিয়া বসাতে ক্রীড়ানিরত পিতোমবাবুর পদসঞ্চালনে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কেহ দেখিল না যে, পিতোমবাবুর মুখখানা ইহাতে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সুভাষিণীর কেশ ধরিয়া একবার পিতোমবাবু সহাস্য বদনে ঝুলিয়া পড়িলেন। সুভাষিণীকে বহু কষ্টে সেই দৈত্য-শিশুর কবল হইতে রক্ষা করা হইল।

খাওয়া লইয়া আর এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। ঘরময় দুধের ঢেউ খেলিয়া গেল। দুই তিনটি পেয়ালা, তিন চারিটি বাটি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। পিতোমবাবু সেই দুগ্ধস্রোতে ছপাৎ ছপাৎ করিয়া হামা দিয়া বেড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টানিয়া সুভাষিণীর আদরের লক্ষ্ণৌ ছিটের নূতন লেপখানা সেই দুগ্ধকর্দ্দমে ফেলিয়া মাখামাখি করিয়া এক নব দক্ষযজ্ঞের সূচনা করিলেন। সুভাষিণী আজ জীবনে প্রথম মিণদের মুখে পরাজিত হইয়া ছলছল নেত্রে এই তাণ্ডব অভিনয় নির্ব্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সুভাষিণী বাটি করিয়া দুধ খাওয়াইতে না পারিয়া পিতোমবাবুকে অগত্যা [illegible]

"ফিডিং বট্‌লে" দুধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। নস্থ খুড়া নস্য লইতে লইতে বলিলেন, 'দুর্গা দুর্গা'।

…'ফিডিং বট্‌লে' দুধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন।

তিন চার দিন অতিশয় যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিয়া পিতোমবাবুকে ক্রমশ আরোগ্যের পথে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। সুভাষিণী শয়নকালে তাঁহার পা টিপিয়া দেন। নস্থ খুড়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাওয়া করেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ শান্তি ও আরাম দেওয়া চাই;—নতুবা পাগল হইয়া যাইবার ভয় আছে।"

৭

কয়েক দিন হইল পিতোমবাবু আবার আফিস যাইতেছেন। নেপেনবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া, আছ কেমন? মনে তো হচ্ছে খেয়ে দেয়ে তোফা ফুলছ।" পিতোমবাবু নিজের বাম চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত করিয়া বলিলেন, "হুঁহু।"

আমি লোকটি কিছু সৌখীন ধরণের। সাধু ভাষায় যাকে মার্জ্জিতরুচি বলে, আমার আজন্মই সেই রকম একটা ভাব মনের ভিতরে আছে। শুনেছি, ছেলেবেলায় ময়লা কাঁথায় শুতে দিলে আমি কুরুক্ষেত্র বাধাতাম, আর যথাসময়ে মুখে পাউডার মাখিয়ে ও গায়ে রেশমের ফ্রক না দিয়ে দিলে আমি সমুদ্রমন্থনের সময়কার সমুদ্রেরই মত চঞ্চল হ'য়ে উঠতাম। বড় হয়েও আমার স্বভাবটা বদলায়নি; বরং আমি মার্জ্জিতভাবের দিকটা আরও গাঢ় ক'রে তুলেছিলাম। বাড়ীর বাহিরে আমার জ্বালায় বৃদ্ধা পিসিমা তাঁর নবাবী আমলের তসরখানি ধুয়ে কদাপি রৌদ্রে শুকাবার জন্য ঝুলিয়ে দিতে পারতেন না—তাতে বাড়ীর সৌন্দর্য্যের হানি হ'ত। বাড়ীর ভিতরে যেখানে সেখানে ঘুঁটে ও পুরাতন শিশি বোতল কেউ স্তূপাকার ক'রে রাখতে সাহস করত না। চাকর-বাকরের নোংরা কাপড় গামছা প'রে বা তৈলসিক্ত নগ্ন দেহে বিচরণ করা আমার আইনে বারণ ছিল। এ ছাড়া চেঁচিয়ে কথা বলা, সশব্দে গলা অথবা নাক পরিষ্কার করা প্রভৃতি নানান বিষয়েও আমার অনেকগুলি 'বাই-ল' ছিল।

আমার বাড়ীর আসবাবপত্র যথাসাধ্য ভাল রাখতে আমি চেষ্টা করতাম। দামী দামী কারপেট, কাউচ, চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি, ছবি ও উৎকৃষ্ট ছাপাই ও বাঁধাইএর বই-পত্রে আমার বাড়ীর তুলনা মধ্যবিত্ত সমাজে প্রায় পাওয়া যেত না বললেই হয়। পোষাক আষাকেও আমার নজর ছিল উঁচু ধরণেরই! এ হেন আমার যে, সর্ব্বেশ্বরের মত বন্ধু কি ক'রে জুটল তা বলা যায় না। সে ছিল যেন মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলারই মত। রং কালো ও মোটের উপর চেহারাটা ভাল থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বেশ্বরকে দেখলেই মনে হ'ত যে, সদ্য ড্রেন থেকে উত্থিত একটি স্প্যানিয়েল কুকুর। লম্বা লম্বা চিরুনী-বুরুশের সম্পর্ক-বর্জ্জিত একরাশ চুল, না-ধোওয়া মুখের উপর এক জোড়া আপোঁছা চশমা, গায়ে একটা

দুই সাইজ বড় কিম্বা তিন সাইজ ছোট সার্ট, একখানা এগার দিন পরিহিত ধুতি ও একজোড়া 'ভেজিটেব্‌ল স্থ' পায়ে, যখন সর্ব্বেশ্বর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমায় দেখে হঠাৎ "এই যে ভাই, কোথায়?" ব'লে গলাটা জড়িয়ে ধ'রে প্রায় ঝুলে প'ড়ে আমার সঙ্গে চলতে সুরু করত, তখন আমার মনে হ'ত যেন আমার অকস্মাৎ কোন চর্ম্মরোগ হয়ে গেছে বা কেউ আমায় বলপূর্ব্বক এক ঝাঁকা আবর্জ্জনা মাথায় দিয়ে ধাঙড়ের কাজে বহাল করেছে। গোপনে সর্ব্বেশ্বরকে আমি ভালই বাসতাম কিন্তু মনের ভিতরের পাপের মতই তাকে আমি লোক সমাজের চোখের আড়ালে রাখবার চেষ্টা করতাম।

সর্ব্বেশ্বর কি ছিল তা বলা যায় না। সে আমার সঙ্গে ছেলেবেলায় এক ক্লাশে পড়েছিল। তার পর সে পাটের দালাল থেকে আরম্ভ ক'রে মন্দিরের পূজুরী, সব কিছুরই কাজ করেছে। বর্ত্তমানে সে সকালে এক জন শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রকাশকের ক্যান্‌ভাসিং ও বিকালে একটা থিয়েটারে 'মোশন-মাষ্টারী' ক'রে এবং উপরি স্বরূপ মাঝে মাঝে আমার কাছে দু'দশ টাকা ধার ক'রে চালাচ্ছিল। অবসর সময়ে তার সঙ্গ আমার ভাল লাগত ব'লেই হোক অথবা কোন মনোবিজ্ঞান-ঘটিত 'ফ্রয়েডিয়ান' কারণেই হোক, সর্ব্বেশ্বরকে আমি কাছে পেলে একাধারে সন্ত্রস্ত ও আনন্দিত হয়ে উঠতাম। সন্ত্রস্ত হতাম, কারণ সর্ব্বেশ্বর স্বভাবতই আমার সাধের আসবাবপত্রের উপর তাণ্ডবনৃত্য করতে দ্বিধা মাত্র করত না; এবং আনন্দিত হতাম, কারণ সে এলে আমার ঘরে ব'সে একাধারে থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস ও হরবোলার কেরামতি দেখা হয়ে যেত।

২

সেদিন বিকেলে ঘরে ব'সে আছি এমন সময় বাইরে মাত্র একটা হ্যাচু ও গোটা দুই হল-চেয়ার গায়ের ধাক্কায় উল্টে দিয়ে সর্ব্বেশ্বর এসে হাজির হ'ল। ঘরের বাইরে এক পাটি কাদামাখা চটি ও আমার বোখারা কারপেটখানার উপর অন্য পাটিটা রেখে সে এসে ধুপ ক'রে একটা গদিমোড়া চেয়ারের উপর ব'সে পড়ল। পা দুটো একটা আবলুস কাঠের টেবেলের উপর তুলে এবং সিগারেট নিতে গিয়ে হাতির দাঁতের বাক্সটা প্রায় উল্টে দিয়ে সর্ব্বেশ্বর বললে, "গোটা পাঁচশ টাকা ধার দিতে পার?"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "সে কি হে, অত টাকা কি হবে?"

সে বললে, "কি বললে দেবে?"

আমি উত্তর দিলাম, "সত্যি কথা।"

সর্ব্বেশ্বরের সিংহাসন গ্রহণ

সর্ব্বেশ্বর বললে, "রেস খেলব। একটা 'টিপ' পেয়েছি ব্রহ্মাস্ত্রের মত অব্যর্থ। ঘোড়া নয়তো যেন বন্দুকের গুলি। ময়দানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে; জকি বেটাকে যেন একটা লাগাম দেওয়া সাইক্লোনের উপর বসিয়ে দিয়েছে। অন্য ঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মোটরকার দিলেও এর আগে যেতে পারবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নামটা কি ঘোড়াটার?" সর্ব্বেশ্বর মাথা নেড়ে একবার "উঁহু" ব'লে একটু ড্রামাটিক পজ দিয়ে বললে, "নাম বলা চলবে না। কিছু ধরতে চাও তো আমি ক'রে দেব। এ যেন টাকা ছড়ান রয়েছে—তুলে নিলেই হয়। 'টোয়েন্টি টু ওয়ান'; কথাবার্ত্তা নেই; লাল হ'য়ে যাবে।" ব'লেই সে বহু কষ্টে অর্দ্ধশায়িত দেহটাকে টেবিলের কাছ বরাবর তুলে তার উপর দুম ক'রে একটা কিল মেরে আমার সাধের ফুলদানিটা উল্টে দিলে।

আমি ফুলদানিটা সোজা ক'রে দিয়ে বললাম, "লাল হয়ে কাজ নেই, এই কুড়িটা টাকা নাও। দশ টাকা নিজের আর দশ টাকা আমার নামে ধ'রে যদি গোলাপি-টোলাপি কিছু হয়ে উঠতে পার তো দেখ।" সর্ব্বেশ্বর হাসি মুখে কুড়িটা টাকা ও এক মুঠো সিগারেট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুতিন দিন পরে তার সঙ্গে পথে দেখা। সে আমার গলার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে, "ভাই কিছু মনে করো না; সত্যি বলছি আমার কোনো দোষ নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, কি হয়েছে কি? ঘোড়াটা বুঝি 'অল্‌সো র‍্যান্' হ'য়ে গেছে?"

সর্ব্বেশ্বর মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে, "আর বল কেন; বেটা রেস-কোর্সের অর্দ্ধেক পথ গিয়ে হঠাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল; তার পর বার দুই চিঁহিঁ চিঁহিঁ ক'রেই বাস খতম! বিষ হে বিষ! 'রাইভ্যাল' ঘোড়ার 'সাপোর্টার' কেউ সাবড়ে দিয়েছে আর কি!" এই ব'লে সর্ব্বেশ্বর চ'লে গেল।

এক জন রেস খেলুড়ে বন্ধুকে ক্লাবে জিজ্ঞেস করলাম যে, একটা ঘোড়া গত শনিবারের রেসে ঐ রকম লোমহর্ষণভাবে মারা গিয়াছে কি না। সে তো হাঁ ক'রে রইল। বললে, "কই না। ও রকম ক'রে তো ১৯১১ না ১৯১২ সালে আমেরিকায় একটা রেসে একটা ঘোড়া [illegible]।"

[illegible] পথে ধ'রে বললাম, "সেদিন আমায় অমন ক'রে [illegible]"

[illegible] বললে, "ভাই, টাকা ক'টা নিয়ে তোমার [illegible] -পোস্টের পাশে লুকিয়ে ছিল, এসে চেপে [illegible]। কি করি, টাকা [illegible] হাত থেকে নিস্তার পেলাম।" তার পর হঠাৎ সর্ব্বেশ্বর, "[illegible] কাকে চীৎকার ক'রে ডেকে সেই

অনিশ্চিত ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল! আমিও মনে মনে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলাম।

৩

দিন কতকের জন্যে দেওঘর গিয়েছিলাম। ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকে দেখলাম সর্ব্বেশ্বর এক জন লোকের কাছে গায়ের মাপ দিচ্ছে। আমি ঢুকতেই বললে, "একটু ব'স ভাই, এই মাপটা দিয়ে নি।" ব'লে সেই লোকটির সঙ্গে এত অনর্গল কথা ব'লে যেতে লাগল যে, সে ব্যক্তি তার খাতা-পত্র নিয়ে বিদায় হবার আগে আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না। সে চ'লে গেলে পর সর্ব্বেশ্বর বললে, "লোকটার সঙ্গে পথে দেখা হ'ল; আমার ওখানেই যাচ্ছিল, আবার অতটা যাবে, তাই এখানে নিয়ে এলাম মাপগুলো লিখিয়ে দেবার জন্যে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার, তুমি আবার জামা কাপড় করাচ্ছ? এ রকম দুর্মতি তো তোমার কখনও দেখা যায়নি।"

সর্ব্বেশ্বর কপালের ঘাম পুছবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজে না পেয়ে মাথা নীচু ক'রে সোফার কভারটার উপর কপালটা পুছে নিয়ে বললে, "আরে ভাই, একটা নতুন দালালির কাজে নেবেছি; কিছু সাজ সরঞ্জাম না থাকলে চলবে কি ক'রে? আজ কাল যা দিন কাল, লোকে শুধু মলাট দেখে বই কেনে, কনের মুখ দেখবার আগে শাড়ী আর গয়না দেখে।"

আমি তার সঙ্গে বসে কিছু ক্ষণ আড্ডা দিলাম, তার পর সে চলে গেল।

* * *

এর পর প্রায় মাস খানেক সর্ব্বেশ্বর এল না। আমারও নানান কাজে তার কথা ততটা মনে পড়েনি। একদিন সকালে একটা পোষাকের দোকান থেকে প্রায় আড়াইশো টাকার বিল নিয়ে হাজির করাতে আমি কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে বিলটা পরীক্ষা করে দেখলাম আমার নাম ও আমার ঠিকানাতেই বিল হয়েছে। আশ্চর্য্য হয়ে আমি সেই দোকানে গেলাম। গিয়ে বললাম, "এ কি রকম, আমি আপনাদের কখনও চোখেও দেখিনি, আর জিনিষও এখান থেকে কিছু কিনিনি; আপনারা আমার নামে এত টাকার বিল পাঠালেন কেন?"

তারা বললে, "সে কি মশায়, আপনার নিজের বাড়ীতে গিয়ে আমরা মাপ নিয়ে এলাম। আপনি নিজে এসে সুট তিনটে নিয়ে গেলেন, আর বলছেন এ বিষয়ে কিছু জানেন না।"

প্রসেসন-অরগ্যানাইজার্ সর্ব্বেশ্বর ঘটক

আমি মহা খাপ্পা হয়ে ওঠায় যে ব্যক্তি স্যুটের মাপ নিয়েছিল তাকে ডাকান হ'ল। সে এসে আমায় দেখে বললে, এই নামের লোকের বাড়ীতে আমি মাপ নিতে গিয়েছিলাম ও এই নামের এক জন ভদ্রলোক স্যুটগুলিও নিয়ে গিয়েছেন বটে, কিন্তু ইনি তো সে লোক নন। তখন হঠাৎ আমি দেখলাম যে, লোকটা সেই কাটারটিই, যার কাছে আমার ঘরে সর্ব্বেশ্বর নিজের মাপ দিচ্ছিল। আমি বুঝলাম যে, সর্ব্বেশ্বর আমার নামেই মাপ দেবার জন্যে আমারই বাড়ী ব্যবহার করে নিজের পোষাক করিয়ে নিয়েছে, এবং বর্ত্তমানে হয় আমায় টাকা দিতে হবে, নয় সর্ব্বেশ্বরকে জেলে দিতে হবে। আমি উপস্থিত মত বিলটা বাকী রেখে সর্ব্বেশ্বরের বাড়ী গেলাম। শুনলাম, সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এক মাসের [illegible] হ'ল সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কি আর করি, তার পোষাকের দামটা দিয়ে [illegible]লাম। ঠিক করলাম, অতঃপর তাকে পেলে অন্তত তার ময়লা কানটা হাত দিয়ে ধ[illegible] না পারলে চিমটে দিয়ে ধরেও মলে দেব। এ কি রকম ব্যবহার তার? বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস বলেও তো জিনিষ আছে!

বহু কাল সর্ব্বেশ্বরের সাক্ষাৎ পেলাম না। শুধু এক দিন মোটরে ক'রে এক বন্ধুর সঙ্গে যেতে যেতে অল্পক্ষণের জন্যে তাকে দেখলাম। একটা কিসের জন্যে যেন চাঁদা আদায়ের দল বেরিয়েছে। ক্ল্যারিওনেট ও হারমোনিয়ম এবং সেই সঙ্গে বেসুরো চীৎকার সব মিলে একটা বিকট সোরগোলের সৃষ্টি হয়েছে। ডি. এল. রায়ের একটা গানের সুর ও কথা বিকৃত ক'রে চেঁচিয়ে লোকের মনে দয়ার উদ্রেক করবার সশব্দ চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের গাড়ীটা দলের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাগ্রে একটা হারমোনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে বাজিয়ে চলেছে। অন্যেরা তার অনুসরণ করছে। তার পায়ে এক জোড়া ভারী বুট ও হাফ মোজা। এক বার ইচ্ছে হ'ল গাড়ীটা থামিয়ে তাকে ধ'রে সকলের সামনে অপমান করি, কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের আমার উপর একটা প্রভাব, সে বহু অন্যায় করা সত্ত্বেও, তখনও ছিল বলেই হোক, অথবা একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে এই ভয়েই হোক, অপমান করা তখন আর হ'ল না। ঠিক করলাম, তাকে একবার এক দিন ঠিক ধরবই ধরব।

আমার সে আশা শীঘ্র সফল হ'ল না। তার বাড়ীতে খোঁজ ক'রে এবং অন্য উপায়েও তার কোনই সন্ধান পেলাম না। ভাবলাম এবার ছোঁড়াটা একেবারে গোল্লায় গেল। যেতে যে তার বাকি ছিল তা নয়—তবু ভাবলাম।

৪

প্রায় ছ মাস হয়ে গেছে। একদিন লালদীঘিতে বেড়াতে গিয়েছি। কোথাও কোন বাজীকর সমবেত ছেলে ছোকরাদের বাজী দেখাচ্ছে। কোথাও কেউ জলের ধারে দাঁড়িয়ে মাছ দেখছে। কোথাও বা ফিরিঙ্গী মেম সাহেবরা মুখে পাউডার মেখে কালো পাথর-বাটিতে রক্ষিত চূণের কথা লোককে স্মরণ করিয়ে স্বজাতীয় ইয়োরোপীয়ান্‌দের হাত ধ'রে বেড়াচ্ছেন। মোটের উপর লালদীঘি বেড়াবার মত জায়গা। পুরাকালে নাকি ওখানে কি একটা মন্দির ছিল। সেখানে এত সিঁদুর ও আবীর ব্যবহার হ'ত যে, তাতে দীঘির জলটা লাল হয়ে থাকত। এখনও বিকেলের দিকে ওখানে এত লোক রংএর মাথায় ঘোরে ফেরে যে, অন্তত সে কারণেও দীঘির নামটার সার্থকতা এখনও লোপ পায়নি।

এদিক ওদিক ঘুরে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। এক মনে কি যে দেখছিলাম বলা যায় না, হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। এক জন ফিরিঙ্গী একটা পেরাম্বুলেটর ঠেলে আসছিল। তার সেই ঠেলা-গাড়ীতে, তার হাত ধ'রে, তার গলা ধ'রে ঝুলে অসংখ্য ছেলেপিলে কিলবিল করছে। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। বাপ! কে বললে ফিরিঙ্গীদের 'আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট' হয়েছে? এরকম ঘোর 'এমপ্লয়মেণ্ট'-ভারে যারা প্রপীড়িত, তাদের অন্য কাজের সময় কোথায়?

লোকটা কাছে এগিয়ে এল। অদূরে বোধ হয় তারই মেম সাহেব—স্থূল কৃষ্ণাঙ্গী বয়স পঞ্চাশ ষাটের মাঝামাঝি—একটি বই পড়তে পড়তে প্রাগৈতিহাসিক কোন 'ম্যামথে'র মতই হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছেন। হ্যাঁ! রত্ন-প্রসবিনীর মতই চেহারা বটে! বোধ হয় প্রাচীন কালে যখন মহাপুরুষদের পত্নীরা শতপুত্রবতী হ'তেন—তখন তাঁরা এই রকমই দেখতে হ'তেন। তা নইলে অতগুলি পুত্রকে শাসনে রাখতেন কেমন ক'রে? এ রকম চেহারা হ'লে মহিষাসুর বধ করা যায়—সন্তান-শাসন তো দূরের কথা।

ছেলে পিলের ভিড়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি ক'রে লোকটা আরও কিছু এগিয়ে এল। ওমা! এ যে আমাদের সর্ব্বেশ্বর! কি সর্ব্বনাশ! তার গায়ের কোট প্যাণ্টুলন টানটান ধরণের—অন্যের সম্পত্তি বোধ হয়—তার পায়ে বুটজুতা ও মাথায় একটা পুলিসের কি অন্য কিছুর হেল্‌মেট। এবার সে আমায় দেখতে পেলে। কী করুণ, ব্যাকুল দৃষ্টি তার চোখে! বুঝি নরকদর্শক দান্তের দিকে পাপীরা এমনি করেই চেয়েছিল! বহু কষ্টে গোটা তিন চার ছেলে মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে সর্ব্বেশ্বর আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে "God! ভাই, আমায় বাঁচাও!"

আমি বললাম, "এ কি কাণ্ড! এ কি করেছ? এ মেমসাহেব আর সন্তান-সন্ততি কোত্থেকে জোটালে?"

সে বললে, "ভাই, তোমায় বিপদে ফেলে—মাপ কোরো ভাই—সেই যে পালালাম, একেবারে রেঙ্গুনে গিয়ে থামলাম। সেখানে দিন কতক চালের কারবার ক'রে ও একটা বাংলা থিয়েটার চালিয়ে কিছু সুবিধা করতে না পেরে কলকাতায় ফিরে এলাম। তার পর কিছু দিন 'সুবুদ্ধি প্রচারিণী সভা'র অরগ্যানাইজার হয়ে বেড়াচ্ছি এমন সময় একটা সুবিধা হয়ে গেল। এক দিন তোমার খরচে করান একটা সুট প'রে—কাপড় ছিল না—ইডেন গার্ডেনে বেড়াচ্ছি এমন সময় এক মেমসাহেব কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। আমার হাত চেপে ধ'রে সে বললে, আমি ঠিক তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর মত দেখতে। আমি তাকে না বাঁচালে তার আর গতি নেই! আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

"সে বললে, 'আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্টের কাজ করত। আজ ছ মাস নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় কাজের জন্যে সে একটা কি পেন্‌সন পেত। তাতেই আমাদের চলত। এখন সে নেই ব'লে টাকাটা আর পাচ্ছি না। তুমি ঠিক তার মত দেখতে, যদি তার হয়ে টাকাটা এনে দাও তো আমার বড় উপকার হয়। দেখ, স্বামী থাকলে তো টাকাটা পেতামই, কাজেই এটা তুমি যদি এনে দাও তো কোনও অন্যায় করা হ'বে না।'

"আমি বললাম, 'আর সই ইত্যাদি? সে সব কি ক'রে হবে?'

"সে বললে, 'আমার বাড়ীতে তুমি চল, তার সই দেখে দশ কুড়িবার অভ্যেস ক'রে নিলেই হবে। নিজে গিয়ে সই ক'রে টাকা নেবে, কেউ সন্দেহ করবে না।'

"আমি দেখলাম, মজা মন্দ নয়। দেখাই যাক না কি ব্যাপার। যদি সত্যি পেন্‌সনটা পাওয়া যায়, তা হ'লে মেমসাহেব নিশ্চয়ই আমায় তার ভাগ দেবে কিছু।

"সই-টই মেমসাহেবের বাড়ী গিয়ে অভ্যেস ক'রে—ও কাজটা আমার আসে এক রকম—বুক ঠুকে পেন্‌সনের আফিসে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাম বলতেই সই করিয়ে টাকা দিয়ে দিলে। একবার কেউ তাকিয়েও দেখলে না আমার দিকে। আমি দেখলাম, বেশ সুবিধা। মেম সাহেব আফিসের বাইরে দাঁড়িয়েছিল—সে টাকাগুলি সমস্তই হস্তগত ক'রে বললে, 'জিক, চল বাড়ী চল।'

"আমি হেসে বললাম, 'নামটা বেশ 'গুড জোক' হ'য়েছে।'

"মেম সাহেব বললে, 'আজ থেকে তুমি আমার জিকই হলে।'

"আমি বললাম, 'তা তো ভালই, আমায় তুমি বাড়ীতে খাইয়ে পরিয়ে রাখ; একটা বাইরের ঘর দিও থাকতে, তা হলেই হবে। আমি তোমার পেন্‌সন ঠিক ঠিক এনে দেব।'

"ভাই, সেই যে মেম সাহেবের কবলে পড়লাম, তার পর থেকে আর নিস্তার পাইনি। তার বাড়ীর একটা ঘরে থাকি। তার সাতশো ছেলে মেয়ে আমায় 'ড্যাডি' ব'লে ডাকে। বুড়ী খেতে দেয় ও ধোপা নাপিতের খরচ দেয়। তা ছাড়া একটি পয়সা দেয় না। কিছু বললে বলে, 'তুমি মনে রেখ যে, জাল করে টাকা নিয়েছ গভর্ণমেণ্টের। আমি যে সে টাকা পেয়েছি তার প্রমাণ নেই কিছু। বেশী গোলমাল করো না।'

"আমি চুপ ক'রে সব সহ্য করি। বুড়ীর হুকুম তামিল ক'রে দিন কাটাই। আমি তার তাঁবেদার 'ডিক'; আমি ঐ সব শয়তানের বাচ্চাগুলির সৎবাপ! ভাই, তোমার পায়ে ধরছি, আমায় বাঁচাও!"

সর্ব্বেশ্বর জব্দ হয়েছে দেখে মনে হ'ল ভগবান তা হ'লে আছেন।

সর্ব্বেশ্বর ওরফে ডিকের সন্তানগণ এত ক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে তাদের মাকে ডাকছিল। তিনি বইখানা নিয়ে এত মত্ত ছিলেন যে, ডিক থেমেছে তা না দেখেই এগিয়ে চ'লে গিয়েছিলেন। এত ক্ষণে তাঁর হুঁস হ'ল। হাঁসফাঁস ক'রে দ্রুত এগিয়ে এসে তিনি সর্ব্বেশ্বরকে প্রচণ্ড এক তাড়া দিয়ে ইংরেজীতে বললেন, "ডিক, তোমার লজ্জা করে না! নিজের কর্ত্তব্য অবহেলা ক'রে একটা নেটিভের সঙ্গে গল্প করছ!"

আমি বেগতিক দেখে সেখান থেকে সরে পড়লাম। সর্ব্বেশ্বর বিদায় কালে শুধু এক বার আমার দিকে চাইলে। জলে ডুববার সময় হাতের কাছে একটা ভেলা পেয়েও হাতছাড়া হয়ে গেলে লোকে যেমন ক'রে তার দিকে তাকায় সর্ব্বেশ্বরের চাউনিটা ঠিক সেই রকমই হয়েছিল।

যুগ পরিবর্ত্তন

প্রথম দৃশ্য

*   *   *

আবেগ জিনিষটা বড় গোলমেলে। সকল কাজের সিদ্ধির মূলেও আবেগ, আবার সকল কাজে ব্যাঘাত দিতেও ঐ আবেগই রহিয়াছে। কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাঠক বা শ্রোতা মহলে খ্যাতি লাভের একমাত্র উপায় তাহার মূলগত আবেগটাকে টানিয়া প্রকাশ্যে বাহির করিয়া দেখান, আবার কোন বিষয় গোপন করিবার অথবা অপরকে ভুল বুঝাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সেই আবেগটাকেই মুখোস পরাইয়া লুকাইয়া বা বাঁকা করিয়া দেখাইয়া সে উদ্দেশ্য সফল করাই পন্থা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সমস্ত সৃষ্টিটার মূলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাণের বা সৃষ্টির আবেগ নিহিত রহিয়াছে, আবার সৃষ্টি নষ্ট করারও মূলে রহিয়াছে সংহারের তাড়না। যে আবেগ প্রেমে সফলতা আনয়ন করে তাহাই ব্যবসাতে মানুষকে দেউলিয়া করে, যে প্রেরণায় মানুষ শ্রেষ্ঠ 'গেরস্ত' রূপে সমাজে পরিচিত হয় সেই প্রেরণাতেই সে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া চির অখ্যাতিভাজন হয়। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানালোচনা করিয়া সঙ্ঘমনের আবেগ আলোড়ন করিয়া আমরা স্বরাজ্য-পার্টির উত্থান বা মডারেটের পতনের যথার্থ ব্যাখ্যান করিতে পারি, আবার কোন বিষয় ধামাচাপা দিতে হইলেও সেই সঙ্ঘ মনের আবেগটাকে মোচড় দিয়া তেরছা করিয়া দেখাইয়া সে কার্য্য সাধন করিতে পারি। বস্তুত এই আবেগের ব্যাপারটা একাধারে সকল রহস্যের উদ্ঘাটক সকল রহস্যের কারণ, সকল অকৃতকার্য্যতা বা সফলতার মূল, সর্ব্ব বিষয়ে সত্য ও মিথ্যা। এ হেন নির্গুণ আবেগের আরাধনা করিয়া গল্পের সূচনা করি।

*   *   *

সকালবেলা চা খাইতে বসিয়া সবে বিস্কুটে এক কামড় ও পেয়ালায় দ্বিতীয় চুমুক মাত্র দিয়াছি এমন সময় বাহিরে ঘন ঘন তোপধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তৎপরে দুমদাম শব্দ, হনন-মত্ত সেনানীর হিংস্র সিংহনাদ ও হতাহতের মরণ-কাতর-আর্ত্তনাদ! ভয়ে চায়ের ঢোক পাকস্থলীর পথ পরিত্যাগ করিয়া ফুসফুসের দরজায় আসিয়া হানা দিল। কাশিতে কাশিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে শয্যা হইতে লেপখানা তুলিয়া লইলাম, শরীরে জড়াইলাম, দ্রুত গড়াইয়া পালঙ্কের নিম্নে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আধো অন্ধকার আধো আলো। ভাবিলাম, তাইতো সন্ধ্যা হইল না কি? কোন প্রকারে মূর্চ্ছাকাতর লেপজড়িত আড়ষ্ট দেহটিকে ন্যাড়া দিয়া ঈষৎ সজাগ করিয়া পালঙ্কের অধোদেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম

ঘরের সকল আসবাবপত্র মায় চা ও বিস্কুট যথাস্থানে মোতায়েন রহিয়াছে। বাহিরে রাস্তায় গোলমাল নাই বলিলেই চলে। ঝাঁটা ও বুরুষ চালনা এবং দু একখানা ময়লা গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি ব্যতীত চরাচর শব্দহীন। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া ভারতীয় কায়দায় কারুকার্য্য করা রি-ইন্‌ফোর্সড কংক্রীটে ঢালা অলিন্দে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম সন্ধ্যা নহে, উষা। পূর্ব্বে লালের আভা, [illegible]বারান্দার রেলিংএ প্রভাতী শিশিরের আর্দ্র সম্ভাষণ। কিন্তু একি? পূর্ব্ব গগনের সে লালকে যেন মুখ ভ্যাঙাইয়া অদূরের সরকারী খাজাঞ্চিখানার শীর্ষ হইতে একটা উৎকট রক্তবর্ণ পতাকা পতপত নিনাদে ভোরের হাওয়ার সহিত কলহ করিতেছে। আশ্চর্য্য হইলাম! কাল ঐ অট্টালিকা-শীর্ষে মহাত্মা গান্ধীপ্রণোদিত চরখাবহ ত্রিবর্ণ পতাকা জগতবাসীকে ভারতের অহিংসা-ডিগনিটি-অফ-লেবার-রাস্কুসে-কারখানাবাদ-বর্জ্জন প্রভৃতি কত কথা মৃদু ভাবে জানাইতেছিল—আজ আবার এ কি উৎপাত! এ তো জাতীয় নব জাগরণের নূতন আশার সূর্য্যের আলো বিকিরণ করিতেছে না, এ যেন পশ্চিমের অস্তগামী তপনের বার্দ্ধক্যজটিল লালসার দেহে অস্ত্র সাহায্যে 'মঙ্কি গ্ল্যাণ্ড'বসান নকল যৌবনের লালিমা।

প্রাণে আতঙ্ক অথচ আত্মাপুরুষ কুতূহল-জর্জ্জরিত। 'যায় প্রাণ থাক' বলিয়া বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিতে চলিলাম ব্যাপারটা কি ও ক[illegible]র গড়াইয়াছে। মার্ব্বেল বাঁধান সিঁড়ি বাহিয়া, অজন্তার অনুকরণে চিত্রিত করিডর অতিক্রম [illegible]রিয়া, তিব্বতী মঠের নকলে উৎকীর্ণ কাঠে গড়া দরজা খুলিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। [illegible]থমেই কানে আসিয়া পশিল—বুরুষের খস্‌খস্ আওয়াজ ও তৎসঙ্গে মিহি গলায় স-দরদে রবীন্দ্র[illegible]থের—

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি

তাই ভোরে উঠেছি—

ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ! ধাঙড়ের সঙ্গে বুরুষের তালে তালে এ গান কে গায়? আবার ফ্রয়েডীয় যাদুঘরের কোন্ কম্প্লেক্স? পুষ্পে ও পুরীষে মিলন; মানব প্রা[illegible] কোন জটপড়া আবেগের ফলে এ অঘটন-ঘটন সম্ভব হইল?

গানটা ক্রমে নিকট হইতে আরও নিকটে আসিতে লাগিল; বুরুষের [illegible] ও নিখুঁত কাওয়ালিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি আশা করিতে লাগিলাম যে আজ বোধ হয় ধাঙড় মহাশয় নিজে কাজে বাহির না হইয়া নিজ পরিবারের অপর কাহাকেও প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন; তাই প্রাতে বুরুষ প্রান্তে এ তরুণ সমাগম।

কিন্তু যখন বুরুষ-চালককে দেখিলাম তখন নিমেষেই আমার সে কষ্টকল্পিত রোম্যান্স অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখিলাম বুরুষ-চালক ও গায়ক একই লোক। চুড়িদার পাঞ্জাবি পরিহিত সুবিন্যস্ত কেশ এক যুবা বুরুষ ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়াছে—ড্রেনের গন্ধকে তাহার প্রাণের কল্পনা কুসুমের প্রভাতী আহ্বান অগ্রাহ্য করিতেছে। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম।

কেতাবের উপর কেতাব সাজাইয়া......কড়া তামাক খাইয়াছে

যুবক কিছু ময়লা সংগ্রহ করিয়া টিনের আধারে সযত্নে তুলিয়া অদূরস্থিত হুইল-ব্যারোতে রাখিল। গাহিল—

হ'ল মোদের পাওয়া,
তাই ধরেছি গান গাওয়া—

আর থাকিতে পারিলাম না ; বলিল্যাম, "ও মশায়, বলি শুনছেন ? সকাল বেলা সুর ভাঁজবার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক কি আর ভাল কিছু পেলেন না ? তাই সখের ধাঙড় সেজে নর্দ্দমাতে 'প্রথম ফুলের প্রসাদ' খুঁজে বেড়াচ্ছেন ?"

যুবক একটা অবাধ গতিশীল ভঙ্গীতে ঘাড়খানা অল্প ফিরাইয়া, আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কমরেড, কর্ম্মক্লান্তির আবেশের মধ্যে যে পুষ্পের সৌরভ লুকান আছে, তার কাছে মধ্যযুগের বেগম-মহলের গুলবাগের খোসবয় কিছুই না।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, ভালবেসে যা করেন তাতেই আনন্দ, আর আনন্দ থাকলেই সৌরভ এ কথা স্বীকার করি ; কিন্তু আমায় যে প্রিয় সম্ভাষণটা করলেন ওটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না।"

যুবক মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "সখে, বললাম 'কমরেড' অর্থাৎ কি না বন্ধু। দুনিয়ার যেখানে যেখানে যে কোণে মানুষের ছেলে খেটে খাচ্ছে. শক্ত হাতে কপাল থেকে খাটুনির ঘাম মুছে ফেলছে, সেখানের হাওয়াতে একটা নতুন ফুল আপনা হ'তে ফুটে উঠছে—বন্ধুত্বের ফুল—সহকর্ম্মের সৌরভ তার প্রাণে, সাহচর্য্যের রঙে সে ফুল রঙীন—সহস্রদলের মতই তার পাপড়ি আকারে বিভিন্ন কিন্তু পরিপূর্ণ শক্তি, প্রাণ, সৌন্দর্য্য ও সমগ্রের সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে মূল্যে এক অর্থাৎ বহু বিভিন্ন মানবে বহু ক্ষেত্রের শ্রমের মধ্যে এই পুষ্পের বিকাশ এবং আকার ও কর্ম্মের বিভিন্নতার মধ্যেও সকল শ্রমিকের সম্মান ও প্রয়োজনীয়তা সমান।"

কি যেন একটা আবেগ আমার প্রাণে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। রুসো, টলষ্টয়, মার্কস, ক্রপট্‌কিন, লেনিন প্রভৃতি মহা মহা পুরুষের বাণী যেন মূর্ত্ত হইয়া আমার চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। কর্ম্মের মধ্যে সাম্যের অমরত্ব যেন ফুটিয়া আমায় পূজায় ডাকিতে লাগিল। যে ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ যুগ যুগ ধরিয়া আমার শত পূর্ব্ব পুরুষকে কর্ম্ম-ক্ষয়ের মধ্যে নির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণের মধ্যে সর্ব্ব জীবের মুক্তি ও মুক্তির মধ্যে মিলন দেখাইয়া আসিয়াছে, সে বুদ্ধ যেন আজ চঞ্চল হইয়া কোদাল, কাস্তে, হাতুড়ি হস্তে নিজ ভ্রম সংশোধনে মাতিয়া উঠিল। যেন আফিমের সম্মোহন বাণ ব্যর্থ করিয়া মদিরার উদ্দাম নেশায় নূতন করিয়া প্রাণ মৃত্যুর পথ খুঁজিতে লাগিল। বুকের রক্ত হিমের আড়ষ্টতা ভাঙ্গিয়া বন্যায় জাগিয়া উঠিল। উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া বলিলাম, "ঠিক বলেছ বন্ধু, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমায় বল, আজ হঠাৎ ভারতের জড় অস্তিত্বের তুষারার্দ্র অঙ্গনে এ আগুন কি ক'রে জ্বালাতে সক্ষম হ'লে।"

যুবক বলিল, "শোননি ! কাল প্রাতে যে দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে। সমগ্র [illegible] আজ কর্ম্মীর শ্রমের মূল্য বাবদ তার সম্পত্তি ব'লে প্রমাণ হয়ে গেছে। সর্ব্বত্র [illegible] জয় হয়ে গেছে। আমরা যুগ যুগ ধ'রে অনুপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের সম্ভোগ-ব্যাধিতে [illegible] ধুঁকে মরছিলাম, আমাদের সকলের উপর কাল প্রাতে সামাজিক ভাবে [illegible]

গেছে—কেউ কেউ আমরা নীরোগ হয়ে কাজে লেগে গেছি—আর কেউ কেউ 'বাট দি পেশেন্ট সাকাম্ব্‌ড' বলিয়া নিজ নিজ অকর্ম্মণ্যতা বহন ক'রে পরপারে গমন করেছে। তুমি বন্ধু, কি ঘুমচ্ছিলে, যে এত বড় কথাটা জান না?"

আমি সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, "না ঘুমিয়ে থাকিনি, মূর্চ্ছিত হয়ে ছিলাম।" যুবক বলিল, "দিনে আট ঘণ্টা পুরো কাজ করতে হবে। দশ মিনিট বেরিয়ে গেল। কমরেড, আজ তবে···।" নির্ব্বাক হইয়া একটা ভঁইষা গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম তাহার চালক একজন সাহিত্যিক-জাতীয় যুবক। মনে হইল, ভাবের বাজারে ভিড়ের মধ্যে কলম চালান আর শকট-সঙ্কুল রাজবর্ত্মে এক জোড়া উদ্দাম মহিষ চালনা দুইয়ে কি সাদৃশ্য অথচ কি পার্থক্য! সে একই আবেগ, শুধু অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য।

ভঁইষা গাড়ীর গাড়োয়ান যেন আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিল, "হ্যাঁ বন্ধু, এ লাঙ্গুল মর্দ্দনের যে গৌরব তার পাশে মাইকেলের মেঘনাদ-বধ লেখা, রবীন্দ্রনাথের বলাকা রচনা মধুমক্ষিকার দুর্দ্দমনীয় আবেগের কাছে প্রজাপতির ফরফরায়নের সামিল। দেখো যেন 'ষ্ট্যাগনেট' করো না। চরিত্রে সব প'ড়ে যাবে। খালি নাড়া দাও। কর্ম্মের ঘোল-মোড়ায় ফেলে জীবন-দুগ্ধকে মন্থন কর; তবেই না মুক্তির নবনীত তোমার নিজের হয়ে দেখা দেবে।"

মুগ্ধ হইলাম। চালায় মহিষ অথচ কি উপমা-কুশলতা! কর্ম্ম চাই কর্ম্মের জন্যই হিমাচল অপেক্ষা তাহার ক্রোড়চর ছাগশিশু অধিক গৌরবময়, উদর অপেক্ষা হস্ত, কপাল অপেক্ষা নয়ন, খাটিয়া অপেক্ষা ছারপোকা এবং পথ অপেক্ষা পথের কুক্কুর অধিক জীবন্ত। এই কারণেই স্বাস্থ্য অপেক্ষা ব্যাধি, পুণ্য অপেক্ষা পাপ এবং আত্মা অপেক্ষা অবয়ব অধিক চিন্তাপ্রসূ। সমগ্র সৌরজগৎ, সমস্ত সৃষ্টি চাক্ষুষ ভাবে মানবসন্তানকে দেখাইয়া দিতেছে, ঘোর, ঘোর, পাক খাও, চল, দৌড়াও, স্থান ও কালের বক্ষে ক্রমাগত নিজের চঞ্চল পদচিহ্ন এখানে ওখানে সেখানে আঁকিয়া দাও, জয় কর, সব আপনার ক'রে নাও—মাথা ঘুরিতে লাগিল।

এই জগত এই সৃষ্টি ইহার মধ্যে কর্ম্মের এই প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনশীলতার আবেগ অথচ এতদিন শুধু ব্রিজ খেলিয়া কাটাইতেছিলাম! লজ্জায় ঘৃণায় ঘাড় হেঁট করিয়া গৃহের দিকে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ম্মের জগতে প্রায়শ্চিত্ত আন্তরিক হয় না—বাহিক প্রবলতার সহিতই তাহা পাপীর মস্তকে আসিয়া পড়ে।

মোটরগাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে যায়
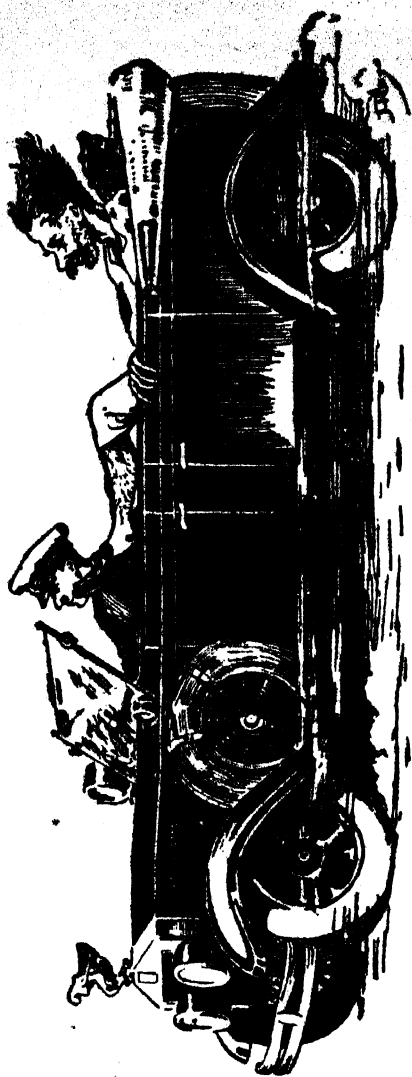
বিজয়বাজিত নগরীর পথ ছাড়িয়া গৃহে চলিলাম। আবেগে টেলিফোনের আরোপযষ্টি বাকলচুলকেও লাল মনে হইতে লাগিল। কবে এক দিন হোলির আবেগে, ধরাবক্ষে ব্রজবাসী চরাচর বিশ্বকে লাল দেখিয়াছিল—আজ আবার জয়-রসে মাতিয়া আমরা জগতকে লাল দেখিলাম।

গৃহে প্রবেশ করিতেই একটা রূঢ় ধাক্কা খাইলাম। দরজায় দেখিলাম এক জন হ্যাটকোটধারী ইংরেজতনয় উবু হইয়া বসিয়া তোলা উনুনে রুটি সেঁকিতেছে। আমায় প্রবেশেচ্ছুক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি চাই। বলিলাম, আমি গৃহের মালিক, নিজের গৃহে প্রবেশ করিতে চাই। সে বলিল, মালিক আবার কি পদার্থ? আমি কিঞ্চিৎ চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে কে যে, আমার দরজায় বসিয়া রুটি সেঁকিতেছে! সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দরজার পথে আর এক বিপত্তির আবির্ভাব হইল। খোঁচা খোঁচা আঁচাছা-দাড়ি এক ব্যক্তি ঢেকুর তুলিতে তুলিতে আসিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল। আমি এবার সত্যই চটিয়া গিয়া বলিলাম, "তুমি কে হে বাপু? আমার বাড়ী চড়াও হয়ে কি করছ?"

সে ব্যক্তি যেন হতভম্ব হইয়া গেল। বলিল, "বাড়ী? বাড়ী আবার কাহারও হয় না কি?"

আমি বলিলাম, "তামাসা রাখ। কার হুকুমে আমার বাড়ীতে তোমরা ঢুকে বসে যা-ইচ্ছে-তাই করছ?"

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল। ইংরেজ পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "লোকটা কি পাগল?"

ইংরেজ-তনয় অতঃপর আমায় সমঝাইয়া বলিল যে, দেশের আইন অনুসারে বাড়ী ঘর আর কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নহে। সকল কর্ম্মীদের ব্যবহারের জন্য সকল বাড়ী বর্ত্তমান আছে। যে যত অধিক শ্রমের কার্য্য করে তাহাকে তত উত্তম বাসস্থান রাষ্ট্র হইতে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। খোঁচা দাড়ি-বিশিষ্ট ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী মিলে মোট-বহনের কার্য্য করে এবং ইংরেজটি নিজে সেই মিলেরই ইঞ্জিনীয়ার। শ্রমাল্পতা হেতু ইংরেজকে বাড়ীর প্রবেশ-পথটি বাসের জন্য দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রম-বাহুল্যের জন্য মোটবহনকারীকে বাড়ীর অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।

আমি বলিলাম, "আর আমি?"

এবার উভয়ে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কর?" আমি বলিলাম, "কিছু না, শুধু লেখাপড়া বক্তৃতা ইত্যাদি।"

খোঁচা দাড়ি লোকটা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তা বেশতো, ভাবছ কেন! আমাদের এখানে ঝাড়-পোঁছের কাজে লেগে যাও আর কি? খাওয়াদাওয়ার অভাব হবে না। শুতেও পাবে।" আমি আপ্যায়িত হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিব এমন সময় ইংরেজ ব্যক্তি আমায় বলিল যে, আমার পক্ষে মানে মানে কোন শ্রমের কার্য্যে লাগিয়া যাওয়াই

মঙ্গল, কারণ, তাহা না করিলে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় আমার জন্ম যে কার্য্যের ব্যবস্থা হইবে তাহাতে আমার অনভ্যস্ত শরীরের শ্রম লাঘব হইবে না। সুতরাং আমি কাজে লাগিয়া গেলাম।

* * * *

সকাল বেলা খোঁচা দাড়ির খাবার ব্যবস্থা করি, তার পর সে মিলের প্রাচীনযুগের ম্যানেজারের ও বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের সম্পত্তি মোটরটাতে চড়িয়া বেড়াইতে যায়। ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব গাড়ী চালায়। আমি সেই সুযোগে আমার সখের লাইব্রেরিতে গিয়া ঢুকি, যেখানে কেতাবের উপর কেতাব সাজাইয়া তাহার উপর বসিয়া লোকটা মেটে কলিকায় কড়া তামাক খাইয়াছে, সেখানটা পরিষ্কার করি। বইগুলিকে যত্নে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া তুলিয়া রাখি যেন আমি প্রাচীন গ্রীসের কোন ক্রীতদাস, গোপনে আপনার উৎপীড়িত সন্তানদিগকে মনিবের চোখ এড়াইয়া আদর করিতেছি। হায় সাম্য, আজ তোমার ধাক্কায় কালিদাসের কাব্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার কমরেড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাগ্যে কালিদাস মরিয়াছেন, না হ'লে বুঝিবা তাঁহাকে দিয়া নব যুগের কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য কম্পোজ করান হইত। অজন্তার গুহা-চিত্র অঙ্কন আজ ঘর-লেপার সামিল। হে সাম্য, তুমি অবশেষে মানুষকে কোথায় না লইয়া ফেলিবে!

টেবিলের উপর শুইয়া নাক ডাকায়

বিকালে মিল হইতে ফিরিয়া আমার মনিব আমারই লিখিবার টেবিলের উপর শুইয়া নাক ডাকায় যতক্ষণ না নৈশ ভোজনের জন্ম তাহাকে জাগান হয়। মানুষটা রোজ বড় বড় শিল্পীর চিত্র দেখে আর হিঃ হিঃ করিয়া হাসে। গ্রামোফোনে উৎকৃষ্ট গান বাজনা শুনিয়া কড়িকাঠ হইতে পাপোষ পরিমাণ হাই তোলে। ইংরেজটা বলে, পরে ইহার শিক্ষার সহিত রুচির উন্নতি হইবে; আমি বলি, হাঁ্য তবে ও তখন আর মোট বহিবে না।

কষ্টে দিন কাটে। ভাবি আবার কবে যুগচক্র উন্নতির চরমে উঠিয়া নিম্নাভিমুখী হইবে।

সমাপ্তি

বন্ধু বলিলেন, "বেশ লিখিয়াছ। প্রায় সত্যের মতই কষ্ট উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে ও দ্বিতীয় দৃশ্যে কমিউনিষ্টিক বিপ্লবের প্রতি লেখকের মনোভাব বিভিন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "উভয় দৃশ্যেই একই আবেগের বিভিন্ন রূপ দেখাইয়াছি। প্রথম দৃশ্যে দেখাইয়াছি, পরকীয় কমিউনিজম্, দ্বিতীয়ে স্বকীয়। উন্নতিশীলতা ও রক্ষণশীলতা শুধু পরদ্রব্যেষু ও স্বীয়দ্রব্যেষুর বিভিন্নতা মাত্র।" বন্ধু বলিলেন, "সাবাস!"

কুমার বাহাদুরের রোগমুক্তি

কলিকাতা হইতে গিরিডি যাইতেছিলাম। গাড়ীটা যথাসম্ভব ধীরে ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া মধুপুর জংশনে গিয়া পৌছিল। শুনিলাম, দুই ঘণ্টা পরে গিরিডির গাড়ী ছাড়িবে। বুঝিলাম যে, এই ধ্যানের দেশে রেলগাড়ীগুলাও অল্পবিস্তর আত্ম-নিগ্রহ সংযম-শিক্ষা প্রভৃতি না করিয়া নড়াচড়া করে না। কি আর করিব, প্ল্যাটফর্ম্মের এদিক হইতে ওদিক অবধি পায়চারি সুরু করিলাম। রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে বিশ্বের সকল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়—এ যেন বিশ্বেরই এক সুলভ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ। মানব-জীবনের প্রায় সকল অবস্থার চিত্রই রেলের প্ল্যাটফর্ম্মে দেখা যায়। জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ সাক্ষাৎভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে না ঘটিলেও এখানে সদ্যজাত শিশু, মুমূর্ষু বৃদ্ধ ও বরবধূর ছড়াছড়ি; ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত প্ল্যাটফর্ম্মে না হইলেও, ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নূতন রেলগাড়ীর আগমন ও বিদায়ের মধ্যে সূর্য্যোদয়-সঞ্জাত জাগরণের তীব্র কোলাহল ও সূর্য্যাস্ত-প্রসূত নিস্তব্ধ নিদ্রার ভাব এখানেও বেশ ফুটিয়া উঠে। কুলি ও যাত্রীগণ পশু পক্ষী অপেক্ষা কম কোলাহল করিতে পারে না—অল্প সময়ের মধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া যাইতেও ইহারা কম পারগ নহে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যেমন নানা প্রকার অকারণ চাঞ্চল্য ও অসহ্য জড়তা আমাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান করিয়া তুলে, রেল প্ল্যাটফর্ম্মের আশে-পাশের নানান ব্যাপার দেখিয়াও আমরা সেইরূপ রেল কর্ত্তৃপক্ষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে হতাশ হইয়া উঠি। এক পাশে দেখিলাম, সারি সারি পুরাতন চটাওঠা মালগাড়ী নিস্পন্দ নিঃসাড়; সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত রেল লাইন, অথচ নড়িবার কোনও চেষ্টা নাই, যেন অশীতিপর বৃদ্ধের দল,—স্বর্গের পথ উন্মুক্ত অথচ মরিবার নামটি নাই। কোথাও কয়েকখানা ইঞ্জিন, কাজ নাই কর্ম্ম নাই, ধোঁয়া ছাড়িতেছে, যেন বেকার যুবক, কখন্ বাহির হইতে কোন্ ড্রাইভার আসিয়া কল-কব্জায় মোচড় দিয়া কাজে লাগাইয়া দিবে সেই আশায় বসিয়া আছে। প্ল্যাটফর্ম্মের ঠিক মাঝখানে বসিয়া একজন বীভৎস-আকৃতি পুরুষ আরসিতে মুখ দেখিয়া সস্মিত বদনে টেরি ঠিক করিতেছে, বিশ্বাস তিনি ব্যতীত কার্ত্তিক ঠাকুরের অপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সত্যই এই প্ল্যাটফর্ম্ম যেন রেল মরু-পথের ওয়েসিস, একটি ছোট-খাট বিশ্ব যেন ইহার মধ্যেই বিশ্বের সকল রস কবিরাজী বড়ির ন্যায় জমাট বাঁধিয়া অল্পায়তন রূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ একদিকে নজর পড়িল। বেজায় ভীড়, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতা দিতেছে। ভাবিলাম হয়তো কোন সাপুড়িয়া কিম্বা যাদুকর রেল প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়া বসিয়াই অবসর সময়ে স্বভাব-সুলভ বুদ্ধিমত্তার তাড়নায় টিকিটের দাম উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। ধীর পদক্ষেপে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার জামা কাপড়

দেখিয়া দুই এক ব্যক্তি একটু জায়গা করিয়া দিল। যাহা দেখিলাম তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এক জন মেদিনীপুরী কিম্বা উড়িয়া ভৃত্য উবু হইয়া বসিয়া একটা হাঁড়ি হইতে কৈ মৎস্য বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের ধূলির উপর আছড়াইয়া মারিতেছে এবং একটা আঁশবটিতে সেগুলির কোটা সমাধান করিয়া এক পার্শ্বে রাখিতেছে। অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে কে সুস্পষ্ট বামাকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আ মরণ! মিন্সেরা ভীড় করেছে দেখ! যেন বাই-নাচ হচ্ছে আর কি।

উবু হইয়া বসিয়া একটা হাঁড়ি হইতে কৈ মৎস্য বাহির করিয়া…

সসম্ভ্রমে তফাতে সরিয়া যাইতেই বাম হস্তে কটাহ ও খুন্তি, দক্ষিণ হস্তে পুঁটুলি এবং হস্ত ও দেহের মধ্যে একটি প্রাইমাস ষ্টোভ ধারণ করিয়া একটি নাতি বৃদ্ধা স্থূলকায়া রমণী মৎস্য-কোটা-রত ভৃত্যের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, প্ল্যাটফর্ম্মের এই অঞ্চল অতঃপর কিয়ৎকাল হেঁসেলে পরিবর্ত্তিত হইবে এবং এই রূপ পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে বাহিরের লোকের না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সে স্থান ত্যাগ করিয়া অদূরে গমন করিয়া কয়েকটি কমলালেবু ক্রয় করিয়া সেগুলির সদ্গতি করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে ছ্যাকছোক জাতীয় শব্দ অযাচিত ভাবে কর্ণে প্রবেশ করিয়া কৈ মাছের ঝোল রন্ধন হইতেছে এইরূপ একটা সন্দেহ মনে জাগাইতে লাগিল। আরও কিছুকাল পরে সেই স্থান হইতে ভীড় সরিয়া গেল; বুঝিলাম ঝোল প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং যে সৌভাগ্যবান পুরুষের জন্য রেল জংশনের প্ল্যাটফর্ম্মের বক্ষে হাঁড়িতে রক্ষিত কৈ-মৎস্য সদ্য নিহত ও ঝোল রন্ধন হয় তিনি সম্ভবত এক্ষণে অবিচলিত চিত্তে সেই ঝোল দিয়া ভাত মাখিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে যে তিনি ঝোল দিয়া ভাত মাখিতেছেন তাহা বাহুল্য ভয়ে আর বলিলাম না।

হতভম্ব হইয়া ভাবিতেছি যে এই পৃথিবীতে কিরূপ জটিল রকম জোড়াতাড়ার সৃষ্টি

হইয়াছে—কেহ খাইতে পায় না, কেহবা রেলে যাইতে যাইতেও কৈ-মৎস্য ভোজন করে, কেহ বস্ত্রের অভাবে শীতে মরে, কেহ বা বস্ত্র-বাহুল্যে গরমে মরে ইত্যাদি। এমন সময় সেই পূর্ব্বশ্রুত বামাকণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল, "মেধো, যা না, খোকাবাবুকে ইঞ্জিন দেখিয়ে আন; যা যা, শীগগির যা, তা নইলে আবার কান্নাকাটি সুরু করবে।

'মেধো' নামধেয় ভৃত্য 'খোকা' নামধেয় ব্যক্তিকে কোলে করিয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইল

ভাবিলাম, মহাপুরুষ এইবার নিদ্রা যাইবেন তাই ক্রন্দন-পরায়ণ বংশধরকে ইঞ্জিনের ছুতা করিয়া গাড়ী হইতে বিদায় করিতেছেন। পর মুহূর্ত্তে মেধো নামধেয় ভৃত্য খোকা নামধেয় ব্যক্তিকে কোলে করিয়া গাড়ী হইতে বহু কষ্টে অবতীর্ণ হইল। যদি হৃদ্‌যন্ত্রের কোন ব্যাধি থাকিত তাহা হইলে আমি অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে আন্দোলনের সৃষ্টি করিতাম, সন্দেহ নাই। শুধু বাল্যকাল হইতে ব্যায়ামের সাহায্যে উক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের চারিদিকে প্রায় দুই মণ পরিমাণ মাংসপেশী ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া খোকাকে দেখিয়াও সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু, হে ভগবান, সে কি দৃশ্য! অনুমান হইল খোকার বয়স চৌদ্দ কিম্বা পনের হইবে, দৈর্ঘ্য চার ফুট চার ইঞ্চি, ওজন সওয়া দুই মন, ছাতি চুয়াল্লিশ ইঞ্চি, কোমর ঐ, স্থানাভাবে অপরাপর মাপ দিলাম না। বর্ণে খোকা বর্ষার মেঘের ন্যায়, পটল-চেরা চোখ দুইটি ঈষৎ টেরা, পরণে জরির টুপি, লাল কোর্ত্তা ও ঢিলা পায়জামা, গলায় কমফর্টার ও পায়ে উলের মোজা। খোকাকে দেখিয়া সামলাইয়া উঠিতেছি এমন সময় মেধো ঠিক আমার পাশে আসিয়া হোঁচট খাইল। মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিলাম, সরিয়া যাই, দেখি, খোকা পড়িলে প্ল্যাটফর্ম্মে কি প্রকার দাগ পড়ে; কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিয়া-

মেধো ও খোকাকে ধাক্কা মারিয়া সিধা করিয়া দিলাম। মেধো স্মিতাস্য হাস্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "এনা হচ্ছেন,—এর ছোট তরফের কুমার। গিরিডিতে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছেন।"

আমি মেধোর সহিত আলাপের সুযোগ না ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও! আর রাজাবাবু বুঝি গাড়ীতে?" মেধো বলিল, "আজ্ঞে না, রাজাবাবু সঙ্গে নেই, এনাকে আমি, বামুন ঠাকরুণ আর সরকারবাবু, আমরাই নিয়ে যাচ্ছি। রাজাবাবু লাটের দরবার হয়ে গেলে পর আসবেন। গিরিডিতে বাড়ী আছে, লোক জন আছে, এক জন ডাক্তারবাবু রোজ আসবেন, রোগা শরীর কিনা; অরুচির ব্যায়রাম, কিছু মুখে রোচে না, টাটকা কৈ-মাছের ঝোল আর পুরানো চালের ভাত না হ'লে খাওয়া হয় না, দু পা হেঁটে বেড়াতে পারেন না, কোলে কোলে রাখতে হয়......"

আমি বলিলাম, "ও! বেশ বেশ, সাবধানে রেখ, দেখ যেন খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত হয়। গিরিডির হাওয়া বড় শুকনো, জোয়ান লোকেই রোগা হয়ে যায়।"

মেধো পুনর্ব্বার দন্তবিকাশ করিয়া বলিল, "সে আর বলতে হবে না; বামুন ঠাকরুণ বড় কড়া লোক; তেনার চোখে ধূলো দিতে পারে এমন লোক জন্মায়নি......"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ তাতো বটেই, তবে কিনা, এই সাবধানের মার নেই, বুঝলে না?"

মেধো বলিল "এজ্ঞে, তা আর বুঝি না?"

২

গিরিডি পৌঁছিবার পর বহু দিন —এর ছোট তরফের কুমারকে দেখি নাই। নূতন জায়গায় আসিয়া ও চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে নিকটে, হয়তো অতি নিকটেই, প্রাকৃতিক বীভৎসতার সেই চরম নিদর্শনটি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াও শিশুর ন্যায় ব্যবহার ও জীবন যাপন করিয়া নিজ পারিপার্শ্বিককে কদর্য্য করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু একদিন তাহাকে দেখিলাম। মেধো, বামুন ঠাকরুণ ও সরকারবাবু পরিবৃত হইয়া খোকা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। একটা ঠেলা-গাড়ীতে দুই জন ভৃত্য তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। খোকার আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত। হাতে একটা বড় লজঞ্চুষের বোতল। বামুন ঠাকরুণ চলিতে চলিতেও সদা সতর্ক। যেন খোকার অঙ্গের কোন অংশ অনাবৃত না থাকিয়া যায়। মেধো আমায় দেখিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল, "সেলাম বাবু, আপনার বাড়ী কি এই-কাছেই নাকি?"

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "না, খুব কাছে না, আর-একটু দূরে।" মেধো আমায় জানাইল, "রাজাবাবু কাল আসবেন, খোকার শরীর তেমন ভাল যাচ্ছে না, রাজাবাবু এসে বড়ই রাগ করবেন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, এদেশের জল-হাওয়া ভাল নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি নীরব হইয়া সব শুনিয়া বলিলাম, "হাঁ তা ঠিক, তবে খোকাকে একটু হাঁটালে চলালে হয়তো শরীরটা আরও ভাল হতে পারে।"

বামুন ঠাকরুণ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি আমার কথা শুনিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া বলিলেন, "ওমা তা কি আবার হতে পারে? ডাক্তারের মানা আছে যে! এত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলি তাতেই এই, হাঁটা চলা করলে কি আর বাঁচবে?"

আমি রণে ভঙ্গ দিয়া, "আর এক জায়গায় কাজ আছে" বলিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। চক্ষের সম্মুখে অত বড় একটা হত্যাকাণ্ড দাঁড়াইয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তার পর যে কয় দিন গিরিডিতে ছিলাম দূর হইতে কখন কখন কুমার বাহাদুরের সেই শিশু-হিমাচল সদৃশ আকৃতি দেখিয়াছিলাম। সাহস করিয়া কখন কাছে যাই নাই; কারণ সেই ঐরাবতের ন্যায় চর্ব্বির বস্তাকে কেহ সাদরে খোকা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে অথবা লজঞ্জুস খাওয়াইতেছে দেখিলে আমার পক্ষে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইত। মেধো, বামুন ঠাকরুণ প্রভৃতিকে উল্টাইয়া ফেলিয়া খোকাকে খানিকটা দৌড় করাইয়া স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্বের পথে টানিয়া আনিবার একটা দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন হয়তো বা আমাকে হাজতের পথের পথিক করিয়া তুলিত—কে বলিবে?

৩

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ওয়াল্‌ফোর্ডের বাস, টালার জলের ট্যাঙ্ক, গ্যাস রিজর্‌ভয়ের, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন বৃহদায়তন বস্তুনিচয় সতত দেখিয়া—এর ছোট তরফের কুমার বাহাদুরের কথা অনেকটা ভুলিয়াছিলাম। তা ছাড়া চাকুরির অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ও 'ওয়ান্টেড কলম' হাতড়াইয়া অবসর সময়ের অভাব এত অধিক ছিল যে স্মৃতির ভাণ্ডার ঘাঁটিয়া মানসিক সুখ সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও মাঝে মাঝে একটা অতিশয় দুঃস্বপ্নের মতই কুমার বাহাদুরের সেই সদা-কম্পমান মেদভারের চিত্র ক্ষণিকের জন্য স্মৃতির আকাশ অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর মেঘের মত অন্তর্হিত হইত। এমন সময় একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল—

WANTED. Highly Educated young man of good character and physique to serve as resident tutor to young boy at [illegible]

family. Knowledge of the Principles of health and hygiene essential. Pay and prospects according to qualification. Apply Box No. ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইলে যেমন একটা আশার নিশ্বাস ফেলে আমিও সেইরূপ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলাম। দিন তিন পরে উত্তর আসিল, আমায় হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীতে গিয়া কোন এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। আমি সেখানে গিয়া বেয়ারার সাহায্যে খবর পাঠাইতেই আমার ডাক পড়িল। উপরে গিয়া একটা কামরায় আমায় ঢুকিতে বলা হইল। ঘরে ঢুকিয়াই তো আমার চক্ষুস্থির! দেখিলাম —এর ছোট তরফের কুমার বাহাদুরদের সরকারবাবু একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া যত্নের সহিত একটি থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "আরে, আরে, এ যে আপনি! আসতে আজ্ঞা হোক। তাহলে আপনিই —বাবু? কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই আপনাদের উমেদার। এ ছাত্রটি কে, যার জন্যে লোক চাইছেন?" সরকারবাবু বলিলেন, "ছাত্রটিকে তো আপনি ভাল ক'রেই চেনেন। আমাদের কুমার বাহাদুর, বুঝলেন না, সেই যে যিনি শরীর খারাপ ব'লে গিরিডি গিয়েছিলেন? রাজা বাহাদুর আর রাণীমা সামনের মাসে কাশী যাচ্ছেন কি না, বুড়ো রাণীমাকে দেখতে। তাই, একজন পাকা পোক্ত লোকের হাতে কুমারকে রেখে যেতে চান। লেখাপড়াও হবে, শরীরের দিকেও নজর রাখবে, এমন এক জন কাজের লোক চাই। তা আপনি হ'লে বেশ হবে, চেনা-শোনা লোক…"

আমি সরকারবাবুর কথার স্রোতে বাধা দিয়া বলিলাম, "তা রাজা-রাণী কাশী যাচ্ছেন, তা হ'লেও আপনাদের বামুন ঠাকরুণ ও মেধো তো আছে, তারা তো খোকাকে খুবই আদরে রাখে।"

সরকারবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, তা ঠিক, কিন্তু বামুন ঠাকরুণ রাণীমার সঙ্গে কাশী যাচ্ছেন; আর মেধোকে কোন বিশ্বাস নেই, কাজেই লোক রাখতে হচ্ছে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। লোক জনের অভাব নেই, বড় বাগান, ফল মূল অনেক, টাটকা খাবেন…।"

আমি আর কথা না বাড়াইয়া বলিলাম, "আহা, সে কথা কি আমি জানি না, তবে কিনা, রাজা-রাজড়ার ব্যাপার আবার কোথায় কার মন জুগিয়ে চলতে হবে, কি করতে হবে এই কথাই ভাবছিলাম।"

আসলে ভাবিতেছিলাম যে, সম্মুখে যে সমস্যা তাহাকে সুবর্ণ সুযোগ বলিব, না, চাকুরের মহা সন্ধিক্ষণ বলিব, কুমার বাহাদুর ওরফে খোকাকে হাতে পাইলে, হয় তাহার জীবনের একটা মহা উপকার হইবে, নয়, আমার নিজের জীবন বিপন্ন হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে পাড়ার সৈনিককে বন্দুকে সঙীন চড়াইয়া উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতে [illegible] যেমন

ক্ষণিকের জন্য তাহার মানস-পটে মহা গৌরব অথবা অপযশ-পূর্ণ মৃত্যুর একটি পরিবর্ত্তনশীল চলচ্চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়, এই মহাক্ষণে আমার প্রাণেও সেইরূপ একটা এস্পার-ওস্পার ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। হয় খোকাকে মেদ-সমাধি হইতে রক্ষা করিয়া নিজের নিকট অনন্ত যশের ভাগী হইব, নয় খোকার চর্ব্বির চাপে নিজেও পিষ্ট হইয়া অমানুষ হইয়া যাইব। আর ভাবিলাম না। সরকারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কি বলেন?"

আমি সজোরে দম লইয়া বলিলাম, "আমি আপনাদেরই, আদেশ করুন, কবে কোথায়, কি করতে হবে?"

৪

প্রাতরাশ—	মধ্যাহ্নে—	অপরাহ্নে—	নৈশভোজন—
দুধ /১।০, কলা ৪টি, সন্দেশ ৮টি, লুচি ১২ খানা, আলুর দম, পোয়াটাক আঙুর, বেদানা, বাদাম প্রভৃতি যথেচ্ছ	সুক্তুনী, ডাল, ভাজা, দাদখানি চালের ভাত, এক ছটাক ঘী, কৈ অথবা মাগুরের ঝোল, দৈ-বড়া, ডালনা, ধোঁকা, অম্বল, পায়েস, সর-ভাজা, রসগোল্লা, এক গেলাস দুধ	পরটা ৬ খানা, খোয়া ক্ষীর আধপোয়া, মাল-পোয়া চারখানি, দুধ, বাদামের ঠাণ্ডাই এক গেলাস (প্রমাণ সাইজ)	লুচি ১৬ খানা, পটলের দোলমা, ছোলার ডাল, মাছের মালাই-কারি, মাটনের কোর্ম্মা, চাটনি, রাবড়ী, সন্দেশ, কমল-লেবুর রস (এক গেলাস)

প্রথম দিন রাজবাড়ীতে পৌছিয়াই খোকা কুমারের সেদিনকার খাবারের ব্যবস্থা দেখিয়া আমার তো চক্ষুস্থির! ছেলেটা যে কেন দিনে দেড় সের হারে ওজনে বাড়ে তাহা আর আমার নিকট গোপন রহিল না। পুরাকালীন রাজনীতির ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিয়াছিলাম যে, রাজপুত্রদিগকে হত্যা করিবার যে সকল প্রথা আছে তাহার মধ্যে বিষদান, ছুরিকাঘাত, গলা টিপিয়া মারা প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজ বুঝিলাম, সুস্বাদু চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় সরবরাহের সাহায্যেও রাজপুত্রদিগকে অতি উত্তম ও নিষ্পাপ উপায়ে হত্যা করা যায়। আমার হাতে যে অভিজাত-বংশীয় বালকের শিক্ষার ভার পড়িল, তাহাকে স্নেহময় পিতা মাতা দাসদাসীগণ তিল তিল করিয়া চর্ব্বিতে চুবাইয়া মারিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিলাম, তাদৃশ নির্ম্মম ব্যাপার প্রাচীন কালের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। স্নেহ যে কত নিষ্ঠুর, তাহা বুঝিলাম। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে রাজা রাণী বাড়ীর বাহির হইবামাত্র এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করিয়া তবে ছাড়িব।

দুই তিন দিন চোখের সম্মুখে কুমারের আহার ও নিদ্রার বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া কৌর

প্রকারে কালাতিপাত করিলাম। তার পর বহু হট্টগোল অশ্রুবর্ষণ সহযোগে রাজা ও রাণীমা পূর্ণ তিন মাসের জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। কুমার বাহাদুর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দাপাদাপি করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সকলে বলিল, "আহা, বাছা রে, এতটুকু ছেলে, মাকে ছেড়ে, বামুন ঠাকরুণকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে?" আমি স্থির করিলাম, ভাল করিয়াই থাকে যাহাতে তাহার ব্যবস্থা করিব।

৮

রাত্রি প্রভাত হইল। কুমার বাহাদুর নিদ্রাভঙ্গের পর ঠোঁট চাটিতে চাটিতে খাটের বেড়া ধরিয়া বহু কষ্টে উঠিয়া বসিলেন। আধ-আধ ভাষে হাঁকিলেন, "মদো, খাবাল আন।"

মেধোকে আমি ছুটি দিয়াছিলাম। বিজয় বলিয়া অপর এক ভৃত্য একটি রেকাবিতে করিয়া দুইখানি হাতে-গড়া রুটি, গুড় ও এক গেলাস ঘোল আনিয়া শয্যাপার্শ্বস্থ ছোট টেবিলটার উপরে রাখিল। সদ্যজাগ্রত ক্ষুধাতুর অজগরকে প্রাতরাশের জন্য একটি চড়ুই পাখী দিলে সে যেমন যথার্থই আশ্চর্য্য হইয়া যায়, কুমার এই রুটি দুখানা দেখিয়া তেমনই নির্ব্বাক মোহাবিষ্ট হইয়া তাকাইয়া রহিল। আমি বলিলাম, "খাও।"

যেন ঘুম হইতে সদ্য জাগিল এই ভাবে কুমার বলিল, "খাব, তি খাব?"

আমি বলিলাম, "ঐ রুটি দুখানা খাও।"

কুমার এইবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর ঘরের চতুর্দ্দিকে মাথার বালিশ, পাশ-বালিশ, কোল-বালিশ, গাল-বালিশ প্রভৃতি বিভিন্ন বালিশ ছুঁড়িতে লাগিল। আমরা বহু কষ্টে সেই ঝড়ের মুখে আত্মরক্ষা করিলাম।

বহুক্ষণ বিকট চীৎকার করিয়া কুমার রুটি দুইখানি খাইয়া পুনর্ব্বার মেধোকে ডাকিতে লাগিল, তাহাকে কোলে করিয়া বাগানে লইয়া যাইবার জন্য। আমি বলিলাম, "তুমি নিজে নিজে হেঁটে যাও।"

ফলে এই হইল যে, খোকা সে দিন সারা সকাল বাগানে বাহিরই হইল না। আমিও সকালবেলা বাহির হইয়া খোকার চিকিৎসার অপরাপর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া আসিলাম। দ্বিপ্রহরে খোকার খাবার বাহির বাড়ীতে দিবার ব্যবস্থা করায় খোকা হাঁটিয়া বাহিরে যাইতে বাধ্য হইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রায় গজ পঞ্চাশ যাট গিয়া যখন সে দেখিল যে, ভোজের ব্যবস্থার মধ্যে খান চার গড়া-রুটি ও দুই টুকরা মাগুর মৎস্যের ঝোল, তখন তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। নিষ্ফল আক্রোশে কুমার নিজের আধ-আধ বুলি ভুলিয়া বেশ বয়স্ক ভাষায় আমার পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিল। আমরা তাহার উত্তরে কিছু না বলিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার পদব্রজে নিজের কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করাইলাম।

এইরূপ খাদ্যের উপর দিন দুই তিন কুমারকে রাখিয়া আমি দেখিলাম যে, শুধু এই উপায়ে তাহার মেদভার কমাইবার চেষ্টা ঝিনুকের সাহায্যে পুকুর সেচিবার চেষ্টার তুল্য। তাই আরও প্রচণ্ডতর উপায়ের উদ্ভাবনা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম।

খাজাঞ্চিখানার এক দরোয়ানের প্রিয় একটা ছাগল ছিল, তাহার কথাই আমার সর্ব্ব প্রথমে মনে পড়িল। আমি দরোয়ানকে কিছু বকশিশ কবুল করিয়া ছাগলটাকে বাগানের এক কোণে আনিয়া রাখিলাম।

তৃতীয় দিবসে খোকাকে প্রাতরাশের পরে চাকর দিয়া বলাইলাম যে, বাগানে অনেক ফলের গাছ আছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া চেষ্টা করিলে হয়তো দুই একটা খাবার উপযুক্ত ফল হাতে পড়িতেও পারে। খোকার অনন্ত উদর-গহ্বরের যে বেকার নব-দশমাংশ সদাসর্ব্বদা হাহাকার করিতেছিল তাহার তাড়নায় খোকা বড়দিনের বাজারের সুপুষ্ট হংসশাবকের ন্যায় ধীর পদক্ষেপে বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। আমিও একটি গাছের আড়ালে ছাগলটার দড়ি ধরিয়া উন্নত পেরিস্কোপ ডেড-নট্‌ধ্বংসী সাবমেরিনের মত গা ঢাকা দিয়া দণ্ডায়মান ছিলাম। খোকা এদিক ওদিক তাকাইয়া ঘুরিতেছে, এমন সময় আমি ছাগলটার বাঁধন খুলিয়া দিলাম। তৎপরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "খোকা, পালাও, পালাও, ছাগলে ঢুঁ মারবে, শীগগির পালাও।" খোকাও ভয়ে কোন দিকে না তাকাইয়া ধীরে ধীরে ছুটিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। ছাগলটাও ঐরকম একটি জীবকে হঠাৎ ছুটিতে দেখিয়া আবার আশানুরূপ ভাবে তাহাকে তাড়া করিল। খোকা একবার ঘাড় ফিরাইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ তাহার প্রকৃতিদত্ত চির-অব্যবহৃত ক্ষমতা যেন ফিরিয়া পাইল। তার পর

........হঠাৎ তাহার প্রকৃতিদত্ত চির-অব্যবহৃত ক্ষমতা যেন ফিরিয়া পাইল।

যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা যুদ্ধে হস্তীর ব্যবহার উঠিয়া যাইবার পরে আর কেহ দেখে নাই। খোকা তাহার বিপুল দেহ লইয়া বেগে ছুটিয়া বাগানে জল দিবার একটা চৌবাচ্চা ছিল তাহার ভিতর গিয়া লাফাইয়া পড়িল। আমরা উত্তেজিত ছাগলটাকে বহু কষ্টে শান্ত করিয়া খোকাকে জল হইতে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেলাম। এই অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয়

দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ খোকাকে সেই দিন মধ্যাহ্নে দুইখানি রুটি অধিক দেওয়া হইল। খোকাও তাহাতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিল।

অতঃপর খোকাকে এক দিন বলা হইল যে, তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন দেওয়া হইবে, তবে মিষ্টান্নগুলি পুঁটুলি করিয়া একটি বৃক্ষের ডালে ঝুলান থাকিবে। তাহাকে একটি মই দেওয়া হইবে, তাহা বাহিয়া উঠিয়া মিষ্টান্নগুলি পাড়িয়া খাইতে হইবে। কুমার সস্মিত বদনে এই প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল। বাগানের যে গাছটির উচ্চ এক ডালে এক পুঁটুলি বাতাসা ও একটি সন্দেশ ঝুলান ছিল তাহার গায়ে একটা মই লাগান হইল। কুমার বেশ সহজেই মই বাহিয়া পুঁটুলি অবধি উঠিয়া গেল এবং আর সময়ের অপব্যবহার না করিয়া পুঁটুলিটি খুলিতে লাগিয়া গেল। যতক্ষণ বৃক্ষের ডালে আকাশ আড়াল করিয়া বসিয়া কুমার সোৎসাহে মিষ্টান্ন ধ্বংস করিতেছিল আমরা তদবসরে মইখানা সরাইয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলাম।

সে খাওয়া শেষ করিয়া নামিবার সময় মই নাই দেখিয়া আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া গেল। বার কয়েক জড়িত কণ্ঠে ডাকাডাকি করিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে নিজেই বৃক্ষ হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় পনের কুড়ি মিনিট ধস্তাধস্তি করিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া গায়ের পায়ের ছাল তুলিয়া অবশেষে কুমার ধরাতলে অবতীর্ণ হইল।

রাজারাণীরা কাশী যাইবার পর প্রায় দশ বারো দিন কাটিয়া গিয়াছে। কুমার জবর-দস্তি-মিতাহারের ফলে এবং মধ্যে মধ্যে ছাগল-তাড়িত এবং অপরাপর উপায়ে লাঞ্ছিত হইয়া ওজনে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তাহার সেই ফুটবলকান্তি দেহ ও মুখের মধ্যে যেন ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছিল। ফলে অবশ্য চেহারাটা আরও সুদৃশ্য ও মনুষ্যোচিতই হইয়াছিল। আমি এই আশাতীত সুফল লাভে উৎসাহিত হইয়া নিত্য-নূতন উপায়ে কুমারকে দেহসঞ্চালনে বাধ্য করিতে লাগিলাম। এক দিন তাহাকে বন-ভোজনে লইয়া গিয়া গাড়ী হারাইয়া মাইল দুই হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিলাম। অপর এক দিন তাহাকে একটা একরোখা ঘোড়ার উপর তুলিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে ঘোড়া তাহার রাস টানাটানি অগ্রাহ্য করিয়া পাঁচ ছয় মাইল ঘুরিয়া আসিল। তারপর শরীর একটু হাল্কা হইয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গেই কুমারের বালকসুলভ খেলাধুলার প্রতি আপনা হইতেই মন যাইতে লাগিল। আমিও তাহাকে লেখাপড়ার ভিতর দিয়া ক্রমাগত খেলাধুলা ও অন্যান্য পুরুষোচিত কার্য্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ফলে কুমার ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল ও দেহের সহিত তাহার মনেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে সময় কাটিতে লাগিল; রাজারাণীদের আসিবার সময়ও নিকট হইতে লাগিল।

উপসংহার

রাজারাণী ফিরিয়া আসিয়াছেন। হৈ রৈ সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। গাড়ী হইতে বড় বড় বাক্স নামিতে লাগিল; স্কন্ধ হইতে ভারি ভারি পুঁটুলি পড়িতে লাগিল; যে যত কম কাজ করিতেছিল সে তত জোরে চীৎকার করিতে লাগিল। রাজারাণী বলিলেন, "খোকা কোথায়?"

বামুন ঠাকুরাণী নাকে কাঁদিয়া বলিল, "ওমা আমার খোকাকে নিয়ে এস না, একবার দু-চোখ ভ'রে দেখি।"

আমি ভাবিলাম, চোখ ভরিবার মত মালমসলা আর খোকাতে নাই।

রাজারাণী ক্রমশ যে ঘরে কুমার পিতামাতার সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য বসিয়া ছিল সেই ঘরে পৌঁছাইলেন। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর কিছুক্ষণ খালি কান্না আর চীৎকার। আমি দূর হইতে আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত বহুবিধ গালি শুনিতে লাগিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কণ্ঠ বামুন ঠাকরুণের। যেন আমি তারই পুত্র-হন্তা।

বহুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর এক জন চাকর আসিয়া বলিল, "রাজা বাহাদুরের হুকুম, আপনি এখনই আপনার জিনিষপত্র নিয়ে চলে যান।"

আমি "আচ্ছা" বলিয়া নিজের জিনিষপত্র একত্র করিতে লাগিলাম।

যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় বাহিরে খুব একটা হৈ চৈ শুনিলাম। দেখিলাম, কুমার বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে এবং বলিতেছে, "মাষ্টার মশায় গেলে আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। তোমরা সব সরে যাও, ছেড়ে দাও আমাকে।"

তার পর, তার পর আর কি! রাজার প্রস্তাব রাজপুত্রের আদেশে (অর্থাৎ রাণীর আদেশে) অগ্রাহ্য হইল। আমি রহিয়া গেলাম—আর রহিয়া গেল কুমারের দেহশ্রী।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।
ন মেধসা ন বহুভোজনেন ॥

"জীবন-মরুভূমি"

(১) অবস্থা

নরহরি প্রেমে পড়িয়াছে!

(২) ব্যবহার

কি করিয়া বুঝাইব তাহার হৃদয়ে কি প্রহেলিকাময় ভাব-সংগ্রাম চলিতেছে? সে চাঁদের আলোয় বসিয়া বসিয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়ে। কবিতার ছন্দে তাহার ভাবনা চিন্তা কথা স্বপ্ন ও পত্রালাপ; এমন কি ছন্দে না মিলিলে সে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করে না। কত খাবার সে খায়ই না, কেননা তাহাদের নাম কবিতায় ব্যবহার করা চলে না। রসগোল্লা! শুনুন একবার নামটা! কি করিয়া কোন সৌন্দর্য্যপিপাসু কবি উহা খাইতে পারে তাহা নরহরি ভাবিয়াই পায় নাই। শেষে কি রসপিপাসু নরহরির রসসমুদ্র গোল্লায় পরিণত হইবে!

ভাল বিপদ! এমন সুন্দর খাবারটা শুধু নামের টাল সামলাইতে না পারিয়া গোল্লায় গেল! নরহরি সিঙ্গাড়াই বা খায় কি করিয়া, আর মেটিরিয়া-মেডিকাই বা পড়ে কি বলিয়া?

এই গদ্যময় জগতের বস্তুতন্ত্রের চাপে কোকিলের ডাকটুকুও না শুনিতে পাইয়া নরহরির জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ঘোর বর্ষায় কলিকাতা শহরে কোকিল ডাকিবে কোথা হইতে? অগত্যা গ্রামোফোনে কোকিলের কণ্ঠস্বরের মত একটি ইংরেজী গানের রেকর্ড পাইয়া তাহার সাহায্যেই নরহরি ক্ষুধিত হিয়ার হিক্কার উৎপীড়ন হইতে নিস্তার লাভ করিল। নরহরির ডাক্তারি-পড়ুয়া বন্ধুবর্গ তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে নানান প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যাধি কি তুচ্ছ ডাক্তারে বুঝিতে পারে? সে যে প্রেমে পড়িয়াছে!

প্রেম—এই প্রেমে রোমিও পড়িয়াছিল, জুলিয়েট পড়িয়াছিল, শকুন্তলা পড়িয়াছিল, দুষ্মন্ত পড়িয়াছিল, সাবিত্রী পড়িয়াছিল, সত্যবান পড়িয়াছিল; নল ও দময়ন্তীও এই প্রেমেই পড়িয়াছিল। এই প্রেমের তাড়নাতেই শূর্পণখা নাসিকা বলিদান দিয়াছিল ও ইহারই প্রকোপে রাবণ থিয়েটারী পোষাক পরিয়া ভিখারীর সাজে সীতা হরণ করিয়াছিল। আর আজ নরহরিও এই প্রেমেই পড়িয়াছে। এক নিমিষে সে এই অপূর্ব্ব প্রেমরাজসভার এক জন সভাসদ হইয়া গেল। তাহার আশে পাশে বিখ্যাত প্রেমিকগণ কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান! দিব্যচক্ষে নরহরি দেখিল আজ সেও তাহাদেরই এক জন হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছে। নরহরি আকুলকণ্ঠে বলিল, "ভাই রোমিও! তোমায় যে বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত

করিয়া চিরনির্ব্বাণ লাভ করে, আজ আমার হৃদয়েও যে সেই একই বিষ, একই ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এস ভাই, তোমার বুকের অনল আমার সহানুভূতির অশ্রুজলে নিবাইয়া শান্তি লাভ কর।" রোমিও দুই হাত বাড়াইয়া ইতালিয়ান আলিঙ্গনে নরহরির কলেবরে রোমাঞ্চ আনয়ন করে। সেই নিবিড় নিভৃত হৃদয়ের অন্তরালস্থিত গোপন পরশস্পন্দনে নরহরি নিঝুম হইয়া বসিয়া থাকে—বাজে লোকে বলে—তাহার লেথার্জিকা এন্‌কেফেলাইটিস্ স্লীপিং সিক্‌নেস হইয়াছে।

হৃদয়ে প্রেম থাকিলে হাওয়াতেও কি এক অপূর্ব্ব রসের আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা শুধু নল দময়ন্তী নরহরি প্রমুখ ভাগ্যমন্ত প্রেমিক-প্রেমিকাগণই বলিতে পারেন। সে রসে বঞ্চিত থাকিবে এই ভয়ে নরহরি দিবানিশি মুখব্যাদান করিয়া জীবনযাপন করে। জিহ্বা তাহার ঐ সুধানির্ঝরিণীর মধুস্রোতে সর্ব্বদা সরস হইয়া থাকে—কিন্তু অজ্ঞ নর অজ্ঞে অর্থহীন মর্ম্মঘাতী ডাক্তারি যন্ত্রপাতি বহন করিয়া নিজেকে জ্ঞানী ও গুণীজন ভ্রমে অহঙ্কারমত্ত হইয়া বলে "নরহরির অ্যাডিনয়েড্‌স হইয়াছে।"

বিজ্ঞান বলে, কোন অঙ্গ ব্যবহার না করিলে তাহা শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই বাস্তবের পঙ্কিলতাময় সংসারে, যাহারা আত্মার ব্যাপার লইয়া সদা সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে বাস্তবের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা ক্রমশ অসম্ভব হইয়া উঠে। নিগূঢ় আধ্যাত্মিক প্রেমের পূজারী নরহরি ক্রমশই বাস্তবের কদর্য্য অসামঞ্জস্যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। সে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠিয়া এস্‌প্লানেডের টিকিট চাহিয়াছিল। বস্তুতন্ত্র-বিষময় সংসারে পুষ্পসৌরভবিমূর্চ্ছিত মনোবৃত্তিগুলিকে কোন প্রকারে জীবিত রাখিয়া যে বাঁচিয়া আছে তাহার পক্ষে ওরূপ একটু ভ্রমপ্রমাদ কি অস্বাভাবিক? তাহাতে রূঢ় টিকিট-বিক্রেতা তাহার আহার্য্য ও পানীয়-বিচার সম্বন্ধে তীব্রভাষা ব্যবহার করায় ক্ষুব্ধ নরহরি ট্রাম হইতে সত্বর নামিয়া পড়িল। ব্যথিত হৃদয় তাহাকে ক্ষণিকের জন্য দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য করিয়া দিল। যেদিকে মুখ করিয়া চলন্ত ট্রাম হইতে নামা উচিত তাহার বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শিথিল চরণে ট্রাম হইতে অবতরণ চেষ্টায় সে সফল হইল বটে, কিন্তু চরণ-যুগল তাহার মাটিতে না পড়িয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ছিন্ন মোজার আবরণ পাদুকা দুটিকে রূঢ় কণ্ডাক্টরের সহিত অসহযোগের ও প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের পতাকা-রূপে জগতের সম্মুখে সগৌরবে হাওয়ায় দুলাইতে লাগিল। পিঠে তাহার কিছু গোময় ও কর্দ্দম লাগিয়া রহিল বটে, কিন্তু মুখে তাহার ছিল সফলতার জ্যোতি এবং বুকে তাহার ছিল বাস্তবের কড়া-বন্ধন মুক্ত দ্বারা অস্পর্শিত নিছক প্রেমের কয়েকটি পবিত্র অশ্রুকণা। লাগিলই বা পিঠে ধুলা, বাজিলই বা শরীরে ব্যথা—হৃদয় তাহার ভালবাসার পূর্ণতায় বেলুনের মত সকল কিছু তুচ্ছ করিয়া ঊর্দ্ধে ভাসিতেছিল।

এই ঘটনাটি লইয়া অনেকে অনেক-কিছু বলিল। কেহ নব্যজ্ঞানলব্ধ মূর্খতায় অভিভূত হইয়া বলিল—নরহরির শরীরে অসংখ্য হুক-ওয়ার্ম বাসা বাঁধিয়া কাল্‌চারাল

করিতেছে ; কেহবা তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কেতাব ক্রয় করিলেই সুতর্ক আপনা হইতে আসে, এই ভ্রমে পড়িয়া তর্ক করিল—যদি নরহরি অতিরিক্ত চা পান করিয়া ও রাত্রি জাগিয়া ভর্জ্জিত কুক্কুট-ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া তাহার ব্লাড-প্রেসারটির সর্ব্বনাশ-সাধনই না করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার মাথা ঘুরিয়া ট্রাম হইতে পতন কি বিনা কারণে হইল ? নরহরিই শুধু বুঝিল যে প্রেম-বিহ্বলতার মূল্য তাহাকে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়াই দিতে হইবে এবং তাহাতে তাহার কোনও অসোয়াস্তি হইল না।

(৩) পোষাক

বাহ্য জগতের সহিত যে প্রেমিকজনের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা সহজে প্রত্যয় হয় না ; কিন্তু তাহাদের সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় এই মাটির পৃথিবীর সহিত ভেজাল-বিহীন ভাবরাজ্যের বুঝি বা একটি সূক্ষ্ম সংযোগতন্ত্রী হতাশের শেষ আশার মতই জোর করিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। এই জোর করার ভাবটাই খুব চোখে পড়ে। নরহরি এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম করে নাই। প্রেমিকজনের সম্মানরক্ষার্থ নখ-শিখ বর্ণনার চিরাগত প্রথা অনুসারে আমরা তাহার পদযুগল হইতে ক্রমশ উর্দ্ধারোহণ করিয়া তাহার টেড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি করিব।

তাহার পাদুকা দুটিকে দেখিলে মনে হয়, যেন ঐ পদপল্লবে ভাগ বসাইবার জন্য জগতের সকল জুতা সতত উদ্‌গ্রীব (অথবা উদ্‌জিহ্ব) হইয়া নরহরির পদযুগলের দিকে শনৈ শনৈ আগুয়ান হইতেছে, তাই উক্ত পদযুগলের মালিক লপেটাদ্বয় স্বার্থরক্ষার্থ ফণা ধরিয়া পাদুকা-জগৎকে "যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-প্রমাণ পায়ের চামড়া নখ ফোস্কা বা কড়া ছাড়িব না" বলিয়া সম্মুখ-সমরে আহ্বান করিতেছে। তাহাদের বীরদর্পে আজ দুই বৎসর যাবৎ নরহরির শ্রীচরণ অপর পাদুকাস্পর্শে কলুষিত হয় নাই।

মোজা জোড়াটা তাহার শত যুদ্ধের জয়-পতাকার মতই ছিন্ন ও মালিন্য-গৌরবে গর্ব্বিত। তাহাদের দয়াতেই বাহিরের আলো বাতাস নরহরির চরণ পরশে জীবন ধন্য করিতে পারে।

তাহার পরনের ধুতিখানি অর্দ্ধমলিন হইলেও পাড়সৌষ্ঠবে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছে। রামধনুর সপ্তবর্ণই তাহার পাড়ে অধিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকটি বর্ণই নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সেই পাড়ে হৃদয়ের সকল আবেগ ঢালিয়া প্রচণ্ডরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের রেষারেষির ফলে ধুতির পাড়খানি সঙ্কীর্ণ রণক্ষেত্রের মতই বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু সেই রণক্ষেত্রের উপরে আকাশের মত অনন্তবিস্তৃত একখানি নীল পাঞ্জাবি সব-কিছু ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যেন ধুতির ছুরির সাহায্যে-কোঁচান ক্লুষ্ণ মূর্ত্তি পাড়খানার ভয়েই পাঞ্জাবিটি চরণ ছাড়িয়া সাবধানতার খাতিরে কয়েক ইঞ্চি উর্দ্ধে রহিয়াছে। পাঞ্জাবির বোতামগুলি জার্মান দেশ হইতে তাহাদের নকল সোনা ও আসল কাচে সজ্জিত সৌন্দর্য্য লইয়া নরহরির বুকে স্থান পাইবে এই আশাতেই বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল। সে আশা সফল হওয়ায় আনন্দের আতিশয্যে কোন কোনটি কাচহারা হইয়া গিয়াছে।

তার পর সেই চশমাখানি! অতল সমুদ্রের কচ্ছপ ও খনির গভীর সোনা দুইয়ে মিলিয়া তার পীতবর্ণের কাচদুটি ধরিয়া বিরাজমান। নরহরির তৃষ্ণার্ত্ত আঁখির আকুলতা সেই পীত পিঞ্জরের ভিতর দিয়া শীর্ণকায় বন্দীর মতই লোকের প্রাণে করুণার উদ্রেক করে। যেন তার দৃষ্টি জগৎকে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, "ওগো!

কেন?

কোথায়?

হায়!

সে কি আর?

ওঃ::!

উহু!" ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির কাহিনী ভাষায় বলা যায় না; আলোক-চিত্রে তাহা প্রস্তর-পুষ্পের মতই অসাড় দেখায়; সিনেমায় বুঝি তাহার নিবিড় ভাবলালিত্যের একটু আভাস ক্ষণিকের জন্য পাওয়া যায়। অবগুণ্ঠনবতীর সরমের মত সেই চাহনি চশমার অন্তরালে মর্ম্মদহনের ব্যথা অঙ্গে মাখিয়া আহত মরালের মত গোপনে মৃত্যু-প্রতীক্ষা করিতে 'চাই কিন্তু পারি না' বলিয়া অপরাধীর মত জড়সড় হইয়া রহিয়াছে। সেই চাহনি দেখিয়া নরহরির মানসপ্রিয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিতা ও চিরবন্দিনী!

আর সেই টেড়ি! বটবৃক্ষ যেমন স্বভাব-সুন্দর হইয়া বাড়িয়া উঠে, মানুষের কৃত্রিমতার যন্ত্র যেমন বটবৃক্ষকে কেয়ারি করিতে সাহস পায় না, তেমনই নরহরির চুল স্বভাব-সৌন্দর্য্যময় গতিতে তাহার মেরুদণ্ড বাহিয়া বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপর তাহা বিচিত্র ভঙ্গীতে অবস্থিত। কোথাও প্রলয়-তুফানের মত তাহা তরঙ্গায়িত, কোথাও তাহা টেনিস-কোর্টের মতই সমতল, কোথাও তাহাতে উত্তেজনা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, আর কোথাও তাহা মরণের ন্যায় শান্ত ধীর। এ যেন তাহারই হৃদয়ের বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি।

হায়, এ হেন নরহরিকে তাহার ডাক্তারিপোড়ো বন্ধুবর্গ 'প্যাকমধরা সারসপক্ষী' আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিল! কেন তাহাদের এ দুর্ম্মতি হইল তাহা বুঝাইতে হইলে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন।

(৪) চলন

হাটিয়া বেড়াইলে নরহরিকে কিঞ্চিৎ অপার্থিব-রকম দেখায়। মনে হয় যেন এই উদ্দাম পৃথিবীতে সে একটা বিরাট্ জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মস্তক সুদীর্ঘ গ্রীবার উপর সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িয়া অবস্থিত। যেন পৃথিবীর কোলে তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব হারাইয়া, সে আজীবন হারামণির অন্বেষণে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অধোদেশে দীর্ঘ রুগ্ন শরীর পূর্ব্ববর্ণিত সাজ-সজ্জায় মণ্ডিত হইয়া আকাশ-প্রদীপের বংশ-দণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান। সে যেন জগৎকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তবে কেন মিছে ভালবাসা ?" প্রতি পদক্ষেপে নরহরি প্রমাণ করিয়া দেয় যে ভগবান মানুষের পদযুগলকে পথ অতিক্রম করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহা হইতে জুতা ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য নহে। যাহারা পরশ্রীকাতর তাহারা বলিত যে তাহার হণ্টন দেখিলে মনে হয় কোনও শুচিবায়ুগ্রস্ত উষ্ট্র সন্তর্পণে মন্দিরপথে চলিয়াছে।

চলিবার সময় নরহরি এদিক-ওদিক চাহিয়া চলিত। কারণ, মানুষ শুধু সম্মুখে তাকাইয়াই চলিবে এমন ইচ্ছা ভগবানের থাকিলে, তিনি মানুষের ঘাড় স্থির অচল করিয়াই সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা যে বিপরীত প্রকার তাহার প্রমাণ মানুষের ঘাড় নাড়িবার ক্ষমতা। এই কারণে ভগবদ্‌ভক্ত নরহরি ভগবানের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিত না। তাহার সম্মুখে ঝুলিয়া পড়া মস্তক যখন ইতস্তত সঞ্চালনে ভগবদ্-উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিত, তখন সত্যই মনে হইত যে তাহার ঘূর্ণায়মান গ্রীবার গতিভঙ্গীর অন্তরালে কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বন্ধুগণ বলিত নরহরির "উদ্দেশ্য ভাল নয়"। কিন্তু নিন্দুক যাহারা, তাহাদের কথায় বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ?

(৫) কাহিনী

কলিকাতার বাহিরে কোন একটি ছোট শহরে নরহরিদের বাসস্থান। সেখান হইতে তাহার পিতা প্রত্যহ ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিয়া একটি মার্‌চেণ্ট আপিসে বড়বাবুগিরি করিতেন। বেশ দু-পয়সা তাহাতে তাঁহাদের আয় হইত।

নরহরি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, সাদরে লালিতপালিত ও চর্ব্বিত-মস্তক। বাল্যকালাবধি সনাতন-রীতি (অথবা ভীতি) অনুসারে তাহাকে বাহিরের আলো বাতাস, উপযুক্ত ও যথেষ্ট খাদ্য, স্বাস্থ্যকর (মূল্যবান্ নহে) পোষাক, খেলাধুলা, গোঁয়ার্ত্তুমি, একরোখামি ইত্যাদি দোষ হইতে দূরে রাখিয়া মানুষ করা হয়। ফলে নরহরি অকালে প্লীহাগ্রস্ত, শীর্ণদেহ, অল্পভীরু ও পরনির্ভর হইয়া বাড়িয়া উঠে। তাহাকে মানুষ-

করা লইয়া তাহার পিতা মাতার প্রায়ই সশব্দ চিন্তার বিনিময় চলিত। ফলে নরহরির বিশ্বাস হইয়া দাঁড়ায় যে পুরুষ জাতিকে সায়েস্তা রাখিবার জন্য স্ত্রীলোক ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্ত্রীলোক যে আবার কোন আকর্ষণের বস্তু এ কথা মাতৃ-অঞ্চলান্তরালস্থিত নরহরি কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা অবধি তাহার এই বিশ্বাস স্থির ও অচল ছিল। সে প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়, স্কুলে কখনও যায় নাই। কেননা স্কুলে গেলে ছেলেরা খারাপ হইয়া যায় এইরূপ একটি জনরব তাহাদের অন্তঃপুর অবধি পৌছিয়াছিল। কিন্তু পাস করিবার পরে তাহাকে কুসংসর্গের বিপদ মস্তকে করিয়াই কলিকাতায় কলেজে যাইতে হইল। অবশ্য সে তাহার পিতার মতই ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিত। কিন্তু তাহাতেও সে আর সংসর্গদোষ-মুক্ত থাকিতে পারিল না। কলেজের বই বলিয়া নরহরি শীঘ্রই উপন্যাস পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মাতা ভাবিলেন পুত্রের পাঠে অসাধারণ মনোযোগ, নতুবা সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক মনে নিত্যনূতন মোটা মোটা পুস্তক হস্তে করিয়া বসিয়া থাকে কেন?

ক্রমে দেখা গেল কলেজে দেরি হইয়াছে ছুতা করিয়া নরহরি বন্ধুদিগের সহিত ম্যাটিনীতে বায়স্কোপ দেখিতেছে। বহির্জগতের সঙ্গে এইরূপে পরিচয় হওয়ার ফলে ইহার পর হইতেই তাহার কলেজের সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ী-ঘোড়া দেখিবার সখ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গেল; বিশেষ করিয়া মেয়ে-স্কুলের বাস যাইবার সময় তাহার রাস্তায় উপস্থিত থাকা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। নিজের মাতা ব্যতীত অপর কোন নারীকে যে কখনও দেখে নাই, তাহার পক্ষে কলিকাতার নূতন জীবন একটি স্বপ্নময় জীবন হইয়া উঠিল। নাটক নভেল ও সিনেমায় তাহাকে এই শিক্ষাই দিল যে, নারী শুধু পুরুষকে শাস্তি দিবার জন্য স্থূলবপু কাংস্য-বিনিন্দিত-কণ্ঠ মারাত্মক-অলঙ্কার ও মর্ম্মভেদী বচন-বিন্যাস প্রভৃতি নিদারুণ উপকরণে সৃষ্ট প্রলয়ের অবতার নহে। পুরুষকে মায়ামুগ্ধ করিয়া শৃঙ্খলাভিলাষী বন্দীতে ও আনন্দবিহ্বলতার জড়স্তূপে পরিণত করিবার সম্মোহন বাণও নারীই। নরহরি তাহার আজন্ম শিক্ষার ফলে পরহস্তে জীবন সমর্পণ করিবার আনন্দটা খুবই উপলব্ধি করিতে পারিত। সে চাহিত আপনাকে বিলাইয়া দিতে, প্রেমিকের মত আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রেমানন্দে মজিয়া যাওয়াটা তাহার কাছে বড়ই আদর্শ অবস্থা বলিয়া বোধ হইত। কলিকাতার কলেজে পাঠ করিয়া ও নানা প্রকার নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়িয়া নরহরির অবস্থা নিরামিষভোজী পরিবারের সন্তানের রেস্তরাঁ-পরিবৃত হইয়া বাস করার মতই হইল। তাহার নমনীয় মন সদাই লুব্ধ লোলুপ হইয়া প্রেম ও নারী লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিত।

ইতিমধ্যে অধিক পাঠ প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে হইল। মির্জ্জাপুরের এক মেসে তাহার বাসস্থান স্থির হইল। কল্পনা আজকাল তাহার উপর এত অধিক অত্যাচার সুরু করিল যে সে প্রণয়-পাত্রীর অভাবে আপন মনে বসিয়া

প্রেম-পত্র লিখিত। তাহার পত্রগুলির মধ্যে অর্থহীন ভাবায় সে শুধু এইটুকুই বুঝাইয়া দিত যে শূন্য মন্দির তাহার আর সহ্য হইতেছে না।

প্রেম-পত্র লিখন ও দ্রুততালে বক্স-হারমোনিয়ম বাজাইয়া জগৎকে নিজের সুর-বোধের অভাব জ্ঞাপন ব্যতীত, ছাদে দাঁড়াইয়া চারিদিকের বাড়ীগুলিতে তাহার 'প্রিয়া' 'মানস প্রতিমা' 'হৃদয়েশ্বরী' 'কুহকিনী' অথবা ঐ জাতীয় কিছু হইবার উপযুক্ত কেহ আছে কিনা দেখাও তাহার একটা কাজ হইয়া দাঁড়াইল।

পাশের বাড়ীতে জানালার ধারে বসিয়া কে একটি নারী সেলাই করিত। তাহার মুখ নরহরি দেখিতে পাইত না, কিন্তু দেখিত, সে একখানা আধ-ময়লা ধূসর রংএর শাড়ী পরিয়া নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। সে ভাবিত—হয়তো ঐ মেয়েটির অবস্থা খারাপ, অন্ন-সংস্থানের জন্য হয়তো উহাকে কাজ করিতে হয়। নরহরি স্থির করিল তাহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু অপরিচিতের দান কি সে গ্রহণ করিবে? যদি সে বলে যে উহাকে ভালবাসে তাহা হইলে হয়তো প্রেমের খাতিরে সে নরহরির দেওয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। ইহার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরহরি ঐ মেয়েটির সহিত ভালবাসায় লিপ্ত হইয়া পড়িল। অর্থাৎ সে বুঝিতে পারিল যে ঐ মেয়েটির প্রতি ভালবাসায় তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সে ভার লাঘব করার একমাত্র উপায় তাহাকে পত্র-লিখন।

যথা চিন্তা তথা কার্য্য। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরহরি প্রণয়ের হতাশ্বাসে ভরা একখানি পত্র একটি টাকায় মুড়িয়া সেই জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল। সে আশায় আশায় রহিল যে এমন গভীর প্রণয়ের প্রতিদান পাইবেই।

বিকাল বেলা মেসের এক তলায় তুমুল কোলাহল শুনিয়া নরহরি দেখিতে গেল কি ব্যাপার। গিয়া দেখিল এক জন শীর্ণকায় ব্যক্তি নিজ মস্তকের সযত্নরক্ষিত কয়েক গাছি চুলও রাগে প্রায় উপড়াইয়া ফেলিবার জোগাড় করিতেছে। ক্রোধে তাহার শ্যামবর্ণ মুখখানা উহারই মধ্যে একটু লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার বৃদ্ধা পিসিমাতার সহিত অকথ্য-রকম পত্রালাপ করিয়া রসিকতা করিবার চেষ্টা যে ব্যক্তি করিয়াছে, তাহার লজ্জা এবং প্রাণভয় দুয়েরই অভাব দেখা যাইতেছে। সে নাকি ইচ্ছা করিলে মেসে আগুন ধরাইয়া মেসবাসী সকলের মাংসে কুক্কুর বিড়াল ও অন্যান্য অনেক রকম জানোয়ারের ভোজের বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করিবে না। তাহার অধীনে নাকি কলিকাতার বেশীর ভাগ গুণ্ডা ও অপর প্রকার দুর্জ্জন কাজ করে এবং তাহার পিসিমাতাকে পত্র-লিখন যমরাজকে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণের সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় ইত্যাদি।

বহু কষ্টে তাহাকে থামাইয়া মেসের অধ্যক্ষ সকলকে ডাকিয়া নানাপ্রকার কঠিন কথা শুনাইলেন। নরহরির তখন আর কিছু শুনিবার মত অবস্থা নহে। এক নিমিষে বাঞ্ছিত প্রাণ-প্রতিমা যৌবন বা কৈশোর হইতে অকস্মাৎ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া যায়,

তাহার মর্মবেদনা অপরে কি বুঝিবে? তাহার সমস্ত অন্তরখানি জুড়িয়া কালো মেঘের মত একটি নিবিড় বেদনা সকল আশা ও সকল আনন্দের আলোক গভীর তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে তাহার প্রিয়া হইতে হইতে হইল না, যাহার প্রণয়দৃষ্টি তাহার পানে চাহিতে চাহিতে চাহিল না, যাহার কুহকে সে ভুলিতে ভুলিতে ভুলিল না, যে তাহাকে ভ্রান্তির খেলা খেলাইয়া চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার কথা নরহরি [illegible] প্রাণে ভুলিবে? অদৃষ্টের এই গুপ্ত-ঘাতকের মত ব্যবহারে নরহরির নবীন হৃদয় নিরাশার হলাহলে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

(৬) বর্ত্তমান

অতঃপর গল্পের সূচনায় যে প্রেমিক নরহরির বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার কথা বলা প্রয়োজন। তাহার ঐরূপ অবস্থা বিনা কারণে হঠাৎ হয় নাই। কি করিয়া সে ঐরূপ বিপদজনক-রকম প্রেমে পড়িল, সেই কথাই এখন বলা হইবে।

নরহরি আজকাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। পিতা ঠিক করিলেন, পুত্র ডাক্তার হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি শহরে অক্ষুণ্ণ থাকিবে; সুতরাং পুত্র, ডাক্তার হইবার পক্ষে সকল-প্রকার অনুপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও, পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থে মেডিক্যাল কলেজে চলিল। কিন্তু এখানে যেমন এক দিকে আহত ভেকের উপর ছুরি চালাইতে নরহরির সবিশেষ বেদনা বোধ হইত, অপর দিকে তেমনি সহপাঠিনী অনেকগুলি থাকাতে ভেকের সহিত তাহার সহানুভূতি দেখাইবার অবসর অত্যধিক ছিল না। সহপাঠিনীদিগের মধ্যে অনেকেই নরহরির নিকট অপ্সরীর ন্যায় রূপসী প্রতীয়মান হইতেন, কেননা ক্ষুধা থাকিলে রন্ধনের দোষ ত্রুটি সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। নরহরির নিকট প্রেমে পতন একটা নৈতিক প্রয়োজন, একটা বিশেষ কর্ত্তব্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং সে যে সহপাঠিনী সুবসনার সহিত ভালবাসায় পড়িবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সুবসনা তাহার সেই গোপন ভালবাসার কারণ হইলেও, সে বিষয়ে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। শত শত ছেলের মধ্যে যে এক জন বিশেষ করিয়া তাঁহারই জন্য ঢেউ খেলাইয়া টেড়ি কাটে, অভিনব সাজে শীর্ণ দেহ সজ্জিত করে ও ক্লাসের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া তাঁহারই সৌন্দর্য্য উপভোগে তন্ময় হইয়া থাকে, তাহা তিনি জানিবেন কি করিয়া? শত শত টেড়ি সাজ সজ্জা ও আকুল চাহনির মধ্যে কোন্‌গুলির মূলে তিনি নিজেই রহিয়াছেন তাহা না বুঝিলে কি সুবসনাকে দোষী বলা চলে?

নরহরি তাঁহার নিকটে বসিবে বলিয়া সকল কার্য্য ফেলিয়া, প্রক্সি দেওয়া [illegible] প্রত্যহ অনেক সময় থাকিতে ক্লাসে যাইতে আরম্ভ করিল। কখন তাঁহার নিকটে আসিতে পারিলে ব্যাকুল নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। কিন্তু সুবসনা

চেতনাহীনের ন্যায় নরহরির সকল চেষ্টা, সকল নীরব আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া আপন মনে পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিতেন।

এই প্রকারে ছয় মাস কাটিয়া গেল। নরহরির জীবন নিরাশার বিষে জর্জরিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক দিন দিবা অবসানে সে বিদেশী হ্যারিকেন নিবাইয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া উপন্যাসে যেরূপ বিবরণ আছে, সেইরূপ করিয়া মনঃকষ্টে আহত বৃশ্চিকের ন্যায় ছটফট করিত। শত শত নায়ক তাহার পূর্ব্বে যেরূপ ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়াছে; নরহরিও, সেই

আহত বৃশ্চিকের ন্যায় ছটফট করিত

বিশাল প্রেমসেবক সঙ্ঘেরই এক জন বলিয়া, নিত্য কখন ধূলায় লুটাইয়া ও কখন প্রচণ্ডরূপে বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করিয়া সঙ্ঘধর্ম্ম পালন করিত। কষ্টে ও আবেগের তাড়নায় তাহার মুখ বিবর্ণ, আকৃতি বিকৃত ও চুল সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিত। সে কোকিল ডাকিলে কঠোর কর্ত্তব্যের খাতিরে সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া জলগ্রহণ করিত না। আকাশে মেঘ দেখিলে তাহার উদ্বেল হৃদয় সুদূরের পানে চাহিয়া সুবসনার কটা চোখদুটিকে কাজল আঁখি বলিয়া মনে পড়াইত। প্রেমের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি পালনে তাহার দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু এক দিন মুহূর্ত্তের মোহে ভুলিয়া সে একটা নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া ফেলিল।

সেদিন কলেজের এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়া নরহরি নামিয়া আসিতেছিল। মনে তাহার একটা শান্ত নির্ব্বিকার ভাবই বিরাজ করিতেছিল। হঠাৎ দেখিল সুবসনা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন। দেখা মাত্র তাহার মনে পড়িল সেই উপন্যাসটির কথা, যাহার

নায়ক সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া নায়িকার পদতলে পড়ার ফলে উভয়ের মিলন অসম্ভব-রকম সহজ হইয়া যায়। নরহরি হঠাৎ কি প্রকার পাগলের মত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এখনি সে সুবসনার পদতলে পড়িয়া হয় আত্মবলিদান দিবে, নয় তাঁহার প্রেমলাভে সক্ষম হইবে।

কলেজের এক জন ছেলে, যে নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়া লজিক পড়িত এবং পরে নরহরির ব্লড-প্রেসর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল, সেই ছেলেটি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। সে বলে যে সে দেখিল সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া নরহরি হঠাৎ কি রকম যেন কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল এবং চক্ষুদুটি একটু টেরা হইয়া যেন নাসিকার দোষ গুণ পরীক্ষা আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ টলিয়া হঠাৎ নরহরি একেবারে তিন চার ধাপ গড়াইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। সম্ভবত তাহার একেবারে জ্ঞান লোপ পায় নাই, কেননা তাহার পড়ার মধ্যে আত্মরক্ষার একটা আভাস ছিল। বেচারী সুবসনা নরহরির পতনের তিন চার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে হঠাৎ কি মনে করিয়া সিঁড়িতে না উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে চলিয়া যান, তাহা না হইলে সে নাকি তাঁহারই উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। লজিক-পড়ুয়া ছেলেটি পরিশেষে বলিল, নরহরির ডিম্ব ভক্ষণ ত্যাগ করা নিতান্তই উচিত।

নরহরি জ্ঞান হইয়া দেখিল এক জন ডোম তাহাকে বাতাস করিতেছে। ফুৎকারে তাহার আশার বুদ্বুদ ভগ্ন হইয়া গেল দেখিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং অনেকের বারণ অগ্রাহ্য করিয়া মেসে চলিয়া গেল। ইহার পর কিছু দিন সে সুবসনা ব্যতীত অন্য বিষয়েও একটু মন দিল। কিন্তু হৃদয়ে যে আগাছা একবার বাড়িয়া উঠে, তাহাকে অল্প সময়ের মত ছাঁটিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া রাখা যাইলেও তাহার মূল যত দিন থাকে তত দিন তাহা কচুরিপানার মত শত অত্যাচার সহ্য করিয়া বারে বারে মাথা তুলিয়া উঁচু হইয়া উঠে। জোর করিয়া তাহাকে ছাঁটিলে কাটিলে তাহা আরও দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠে মাত্র।

কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে নরহরি আবার কল্পনা-রাজ্যে সুবসনার পরম আদরের ধন হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। কখন জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কল্পনা-সৈকতে সুবসনা তাহাকে সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া প্রেম জ্ঞাপন করে কখন বা নিভৃত রজনীর কোলে তাহারা দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া, অনন্তের পানে দুই বাহু বাড়াইয়া 'আসি, আসি' বলিয়া ছুটিয়া চলে। কখন আবার নির্জ্জন সমুদ্র-সৈকতে নরহরি যখন ভয়ব্যাকুল চাহনিতে দূরে তরণী আছে কি নাই দেখিতে ব্যস্ত, তখন আলুলায়িতকুন্তলা সুবসনা সুমিষ্ট বংশী-বিনিন্দিত কণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠে, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

নরহরি দেখিল সুবসনা ব্যতীত জীবন-ধারণ অন্তত কর্ত্তব্যের খাতিরেও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে যেমন করিয়া হউক সুবসনার ভালবাসা পাইবেই পাইবে স্থির করিল।

অমৃতবাজার-পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে সে দেখিল এক ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মতভাবে মানুষকে উড়ি পরাইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে এইরূপ আশ্বাস

দিয়াছে। খরচও তাহাতে কমই হইবে। নরহরি খিদিরপুরে তাহার নিকটে উপস্থিত হওয়াতে, সে ব্যক্তি দুই মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে কোন কঠিন-হৃদয়ার নির্মম কবলে পড়িয়াই নরহরির সকল সুখ-শান্তির অবসান হইয়াছে। সে বলিল যে বাম বক্ষের উপর উর্ব্বশীর মূর্ত্তি লাল ও নীল রঙে দুই-পূর্ণ-তেরোর-তিন ইঞ্চি করিয়া উল্কি করিলে প্রেমে সফলতা ও টাকপড়া নিবারণ—এক ঢিলে দুইটি পক্ষী আহত করার মতই সুখকর ও সহজভাবে সাধিত হইবে। এ বিষয়ে এক জন মুক্তিয়ারের সলেফাফা প্রশংসাপত্রও সে দেখাইতে প্রস্তুত আছে। মোট খরচ তেরো টাকা বারো আনা মাত্র। নরহরি এত সহজে অল্প খরচে কার্য্য সাধিত হইবে জানিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার জামা খুলিয়া ফেলিল ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া উল্কিকারের সূচিকার দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া ও তেরো টাকা বারো আনা পরসাৎ করিয়া হৃদয়ের উপর রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজের অন্তরালে উর্ব্বশীকে লইয়া যখন মেসে ফিরিল, তখন তাহার মুখদর্শনে মনে হইল যে, প্রাণের ব্যথা হয়তো বা সত্যকার ব্যথার মতই মর্ম্মভেদী। কিন্তু হায়, উর্ব্বশী নরহরির হৃদয়ে চির দিনের মত স্থান পাইলেও তিনি সে অধিকারের মূল্য-স্বরূপ তাহাকে সুবসনার ভালবাসা আহরণ করিয়া দিলেন না। লাভের মধ্যে এই হইল যে নরহরি অতঃপর মেসের কলতলায় স্নান করা ত্যাগ করিল। ক্ষুদ্র স্নানের ঘরের সম্মুখে তৃষিত চাতকের মত প্রত্যহ তাহাকে স্নানার্থে অপেক্ষা করিতে দেখা যাইত।

এই সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীগণ স্থির করিলেন তাঁহারা টেনিস খেলিবেন; এবং তাঁহাদের উৎসাহে শীঘ্রই একটি কোর্ট ছাত্রীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। সেই কোর্ট এক অভিনব টেনিসের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ছাত্রীদের টেনিস-জ্ঞানের সপক্ষে একটু বলা দরকার যে প্রত্যহই তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অন্তত একবার বলটিকে র‍্যাকেটের সাহায্যে আঘাত করিতেন এবং সপ্তাহে প্রায় দুই তিনবার বলটি যথাস্থানে গমন করিত।

(৭) সমাপ্তি

প্রোফেসর ক—এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিবারণ। সে টেনিস খেলায় খুবই উৎসাহী ও তৎপর। সেই কারণে তাহাকে কলেজের সকলেই খুব পছন্দ করিত। প্রত্যহই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেখা যাইত এবং সেই সর্ব্বশেষে উক্ত স্থান ত্যাগ করিত।

ছাত্রীদিগের ক্লাবের কাপ্তেন ছিলেন স্বয়ং সুবসনা। তাঁহার ক্রীড়াতে খুবই দ্রুত উন্নতি দৃষ্ট হইতেছিল। এমন কি সকলে বলিতে আরম্ভ করিল যে শীঘ্রই সুবসনা অনেক পুরুষ খেলোয়াড়কে সহজেই পরাভূত করিতে পারিবেন। তাঁহার নাকি ওভারহেড স্ম্যাশ নামক মারখানি অত্যন্তই সুসম্পন্ন হয় এবং সার্ভিসও তাঁহার বিশেষ উন্নতিশীল।

কিছু দিন পরেই দেখা গেল যে ছাত্রীদের ক্লাবে ছাত্র ও প্রোফেসর-জাতীয় খেলোয়াড়গণ নিমন্ত্রিত হইতেছেন এবং মিক্সড ডাব্‌ল্‌স অর্থাৎ এক জন পুরুষ ও এক জন নারী একদিকে হইয়া খেলা খুবই প্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু সকল ছাত্রেরা সে নি[illegible] পাইত না, কেবল ছাত্রী-খেলোয়াড়দিগের বন্ধুবর্গ ই সে সম্মানে সম্মানিত হইত। [illegible]ফেসর ক— এবং তাঁহার ভ্রাতা নিবারণ প্রায়ই মিক্সড ডাব্‌ল্‌স খেলিতেন এবং তাঁহাদের উৎসাহেই নাকি ঐরূপ খেলার দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। ইহাতে কলেজে নিবারণের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল এবং যে সকল ছাত্র কদাপি কোন প্রকার খেলার ছায়াও মাড়াইত না, দেখা গেল তাহারাও টেনিস-ক্লাবের সভ্য হইতে দলে দলে অগ্রসর হইতেছে।

নরহরি সকল প্রকার খেলাধুলাকে আজন্ম শিক্ষা ও প্রেম-দর্শনের প্রভাবে বর্ব্বরতা ও পাশবিকতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সুবসনার হস্তে টেনিস র‍্যাকেট দেখিয়া তাহার এই আজীবন যত্নে প্রতিপালিত মনোধর্ম্মে একটা সাংঘাতিক নাড়া পড়িল। সে হঠাৎ দেখিল যে এই খেলাই যুগধর্ম্ম। তাহার পর বন্ধুবান্ধব ও সম-প্রেমিকগণকে বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাওয়াইয়া নরহরি সত্তের টাকা দিয়া একখানা র‍্যাকেট কিনিয়া ফেলিল; এবং উক্ত যন্ত্র হস্তে লইয়া যখন সে নিবারণকে গিয়া বলিল যে, সে টেনিস খেলিবে, তখন একান্তই সুস্থ শরীর বলিয়া টেনিস-কাপ্তেনের সে যাত্রা আকস্মিক মৃত্যু হইল না।

নরহরি সাত দিনের মধ্যেই বুঝিয়া ফেলিল যে র‍্যাকেট দিয়া বলটাকে আঘাত করিয়া জালের অপর পার্শ্বে পাঠানই টেনিস-খেলার উদ্দেশ্য। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল যে, অপর ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত বলটিকে বাঁচাইয়া চলাই খেলার উদ্দেশ্য এবং র‍্যাকেটখানা আত্মরক্ষার একটা শেষ অস্ত্র মাত্র। ইহার পরেও নরহরি বহুকাল ধরিয়া বুঝিতে সক্ষম হইল না যে কেন র‍্যাকেটখানা বলের অনুসরণ করিবে না এবং তাহার ভুল ধারণার ফলে তাহার সহিত খেলা একটা সাহসের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু হায়, ছাত্রীদের ক্লাবে নরহরির ডাক আর আসে না! সে হতাশ হইয়া উঠিতেছিল। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, যে নিবারণের সহিত ভাব করিলে তাহার সুবসনার ক্লাবে নিমন্ত্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া নিবারণের সহিত ভাব করিতে ব্রতী হইল। প্রথম প্রথম সে নিবারণকে তাহার নিজের লিখিত কবিতা পড়িয়া শুনাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু খোলা হাওয়া ও প্রচুর ভক্ষণের পক্ষপাতী নিবারণ সে প্রলোভন খুব সহজেই সম্বরণ করাতে তাহাকে অন্য উপায় খুঁজিতে হইল। অতি অল্লায়াসেই সে বুঝিতে পারিল যে নিবারণের বন্ধুত্ব-ভাবপ্রবণতার কেন্দ্র হৃদয় নহে, উদর। এবং এই জ্ঞানলাভের ফলে নরহরির বহু [illegible] কলেজের অন্ধকার রেস্তরাঁটিতে পরহস্তগত হইতে লাগিল। নিবারণ অতি [illegible] নরহরিতে আত্মসমর্পণ করিল এবং কলেজের সকলে বলিতে লাগিল, নরহরি মানুষ [illegible] উঠিতেছে। এক দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিবারণ নরহরিকে বলিল, "ওহে, আজ [illegible] মেয়েদের কোর্টে টেনিস পেটা যাক। তোমার যা খেলা তাতে তারা খুশী বই [illegible]

না।" নরহরি বহু কষ্টে হৃদয়ের আনন্দ-ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আ—চ্ছা।" আজ তাহার কি শুভদিন! যে নিদারুণ বিরহ-বেদনা তাহার জীবন ব্যাপিয়া আজ এতকাল ধরিয়া তাহাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে, বুঝিবা আজ গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে তাহার অবসান হইতে চলিল। হৃদয় তাহার কোন্ এক অজানা আনন্দের স্পন্দনে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"নরহরি, আজ তোমার প্রেমের তপস্যা পূর্ণ হইতে চলিল। ভক্তহৃদিনিঃসারিত রক্তে আজ দেবতা তুষ্ট হইয়া ভক্তকে ঈপ্সিত ধনে পুরস্কৃত করিবেন। নরহরি, যে ক্ষিপ্ত প্রেমজ্বালা তোমায় জীবনের সুদীর্ঘ দিবসগুলির ভিতর দিয়া কুকুরের শৃগাল-তাড়নের মত করিয়া দৌড় করাইতেছিল, আজ বুঝি তাহার কবল হইতে তুমি সফল প্রেমের শান্তিময় গহ্বরে আশ্রয়লাভ করিতে চলিলে। হৃদয় তোমার আনন্দের অশ্রুজলে সিক্ত সরস হইয়া উঠিতেছে। নরহরি, তুমি সাধক, তুমি তাপস, তুমি বুদ্ধের মত বাস্তব-পঙ্কিলতামুক্ত, প্রেমের অনলে তোমার হৃদয় শোধিত স্বর্ণের ন্যায় পবিত্র, উজ্জ্বল।"

বুকের উপরে উর্ব্বশীর মূর্ত্তিখানি চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া, টেনিসের পোষাক পরিয়া নরহরি নিবারণের সহিত মেয়েদের ক্লাবে খেলিতে গেল। পরনে তাহার আর সেই নীল পাঞ্জাবিও নাই, সেই লপেটাও নাই, সেই বিচিত্র পাড়ের বস্ত্রও নাই। সাদা পাতলুন পরিয়া তাহাকে কোন পাশ্চাত্য কবির শ্যামবর্ণ সংস্করণ বলিয়া মনে হইতেছিল। হাতের র‍্যাকেটখানা সে তিন আঙুলে ধরিয়া নিজের অন্তরের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছিল।

হঠাৎ সে শুনিল নিবারণ বলিতেছে, "ইনিই নরহরিবাবু, কবি ও দার্শনিক। খুব ভাল লোক। ইত্যাদি।" দেখিল সম্মুখে সুবসনা কমনীয় হাস্যে টেনিস-কোর্ট আলো করিয়া দণ্ডায়মানা। নরহরির রোমাঞ্চ হইল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাহার কেশ তৈললিপ্ত থাকাতে সেই রোমাঞ্চের কোন চিহ্ন সেখানে দেখা গেল না।

নিবারণ বলিল, "নরহরি, তুমি এঁর সঙ্গে পার্টনারশিপে খেল, আমি মিস্—এর সঙ্গে খেলছি।" নরহরি এই পার্টনারশিপকে নিদর্শনাত্মকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিল।

খেলা আরম্ভ হইল। নরহরি উপর্য্যুপরি চার বার সার্ভ করিয়া জালে বল লাগাইয়া দেখিল সুবসনা তাহার দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিতেছেন। সে বিহ্বল আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তার পর নিবারণের সার্ভিসের পালা। সে বেশ সজোরে সার্ভ করিত। কিন্তু সুবসনা সে সার্ভিস অবাধে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া নরহরি কিরূপ একটা

সে সুবসনার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সুবসনা তখন মিস্—এর প্রক্ষিপ্ত একটি লব্ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বল লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব আলোর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইচ্ছা বলটিকে মাথার উপর হইতে সজোরে আঘাত করিয়া বিপক্ষের কোর্টে ফেলিবেন। তাঁহার এই প্রকার মার কলেজে বিখ্যাত।

নরহরি শুধু এক বার সেই শক্তিময়ীর মুখের দিকে চাহিল। শুনিল কে পরুষকণ্ঠে বলিতেছে, "গেট আউট ফ্রম হার নোজ, ইউ ইডিয়ট!" তার পর সব অন্ধকার। সুবসনার ওভারহেড স্ম্যাশ বলে না লাগিয়া তাঁহার ভক্তের মস্তকেই লাগিল, এবং ফলে ভাবপ্রবণ নরহরির মূর্চ্ছা ও পতন। সকলে ভীষণ অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি নরহরিকে

নরহরির মূর্চ্ছা ও পতন

উঠাইয়া একটা ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রোফেসর ক— নিকটেই ছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন বিশেষ কিছু হয় নাই এবং আঘাতকারিণীকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। মিষ্ট ভর্ৎসনার কারণ ছিল।

নরহরির তখন সবে জ্ঞান হইতেছে। সব-কিছু আবছায়া ও দুর্ব্বোধ্য লাগিতেছে। সে শুনিল কে বলিতেছে, "মাই ডিয়ার, ইউ আর পারফেক্ট্লি ডেন্জারাস। ফ্যান্সি স্ম্যাশিং দ্যাট পুওর ইন্ফ্যান্ট অন দি হেড! তোমার সহধর্ম্মের মধ্যে ডাক্তারী পাঠ চলতে পারে, কিন্তু স্বামীকে অতিক্রম করে পরাক্রম দেখান উচিত নয়।" নরহরি ভাবিতেছিল, কে কাহার স্বামীকে অতিক্রম করিল? এমন সময় নিবারণ বলিয়া উঠিল, "বৌদি, তুমি বাপু বিলেতে গিয়ে উইম্ব্ল্ডনে খেলো। এ প্লীহাগ্রস্ত দেশে তোমার স্থান নেই।"

নরহরি একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহের বশীভূত হইয়া উঠিয়া বসিতে গেল। প্রোফেসর ক—বলিলেন, "আপনি উঠবেন না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আমার স্ত্রী আপনার কাছে ব'সে অনুতাপ করুন।"

সুবসনা তাহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। নরহরি সম্ভবত মাথার যন্ত্রণাতেই বিকৃত মুখ করিয়া চক্ষু বুজিল।

হারুণ্-অল-রসিদের পুনর্জ্জন্ম

কল্পনাশক্তিকে যদি কোন প্রকারে বিশেষ রকম উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা যায় তাহা হইলে নানা-প্রকার অসম্ভব জিনিষ মানসচক্ষে দেখা যাইতে পারে। যেমন শোনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েল্‌স মনে মনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াইয়া মনে শান্তি না পাইয়া একদা এক অপরূপ শার্দ্দুল-ষণ্ডের শৃঙ্গ-নখর-গলকম্বল তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাসম্পন্ন স্বপ্নচ্ছবি দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠেন এবং পর দিন প্রাতে তাঁহার বিখ্যাত 'ডক্টর মোরোজ আইল্যাণ্ড' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থে তিনি ডক্টর মোরোরূপে বিবিধ জন্তুর দেহে অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ করান ও অবশেষে ঐসকল জন্তু-মানবের হস্তে ধর্ষিত হইয়া উপন্যাসের সমাপ্তি করান। এইরূপ কল্পনা-প্রভাবে আরও বহু গ্রন্থকার অভিনব ও অসম্ভব বহু জীব ও জড়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কেহবা রক পক্ষীর একটি মাত্র ডিম্বে সহস্র অমলেট প্রস্তুতের উপকরণ পাইয়াছেন। কেহ কোন বোতল অথবা প্রদীপবাহন দৈত্যের সাহায্যে রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করিয়াছেন, কেহবা বেলুনে চন্দ্রলোকে ভ্রমণ করিয়াছেন; কেহ আবার সমুদ্র-গহ্বরে বিশাল নগরী আবিষ্কার করিয়াছেন ও তন্নগরীতে 'ল্যাণ্ড স্পেকুলেশন' করিয়া অশেষ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কল্পনায় যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, সত্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা কল্পনাতীত। এই জন্যই ইংরেজ কবি, না দার্শনিক, না আর কেহ বলিয়াছেন,—যাহা বলিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, সহসা সম্মুখে সত্যের আবির্ভাব হইলে গল্পের পিতৃনাম-বিস্মৃতি ঘটে। কল্পনাশিখরে আরোহণ করিয়া মানুষ অসম্ভবের চক্রনেমীর দর্শনলাভে পুলকিত হইয়া উঠিতে পারে বটে; কিন্তু সত্য যে চতুর্দ্দিকে অনন্ত বিস্তৃত, তাহার সীমা নাই—কালের কোলে তাহা মানবের, সুতরাং মানব-কল্পনার জন্মের অনন্ত কোটি বৎসর পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত, স্থিতির ক্ষেত্রে তাহা মানব-কল্পনাকেন্দ্র এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে আরও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অবস্থিত। সুতরাং গল্প বা উপন্যাস অপেক্ষা সত্য ঘটনাই অধিক রোম্যান্টিক, লোমহর্ষণকারী, আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়। আমি যে কাহিনী বলিতে যাইতেছি তাহা সত্য, অতএব কল্পনাতীত-রূপে কাল্পনিক; শুনিলে তাহা অসম্ভব মনে হইলেও তাহা ঘটিত-ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২

শঙ্করা জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিবাসে অড়েয়, স্বভাবে ছিঁচকে ও ব্যবসাতে আমার খাস-বেয়ারা। দৈর্ঘ্যে সে তাহার নিজ হস্তের সার্দ্ধ তিন হস্ত ও মাপকাঠির চার ফুট সাড়ে দশ

ইঞ্চি, বর্ণে সে উজ্জ্বল কষ্টিবর্ণ, কেশে টাকপ্রবণ ও চেষ্টাসত্ত্বেও অনুদগত টিকি, দন্তে কদাচ মুক্ত ও আয়তনে অমিতোদর। শঙ্করা কার্য্যে তৎপর, ধৈর্য্যে ফুটবল ও চৌর্য্যে পারদর্শী, পারিলে ডাকটিকিট হইতে গঁদটুকু চুরি করিয়া চাটিয়া খায় এবং আমার অবর্ত্তমানে আমারই চায়ের টেবিলে বসিয়া আমারই অনুকরণে মহোল্লাসে চা পান করে। সে কোন্ শার্টের সহিত কোন্

······চা পান করে

সুট মোজা অথবা টাই মানাইবে তাহা ঠিক জানে, পাঞ্জাবি গিলে করিতে অথবা কাপড় কুঁচাইতে সুপটু এবং জুতা পালিশ করিতে অদ্বিতীয়। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার কোন কার্য্যে আপত্তি নাই, কোন খাদ্যে অরুচি নাই, শুধু স্বজাতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে সে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ধারারূপে উপস্থিত হয় এবং গঙ্গাস্নান, পূজা-অর্চ্চনা ব্যতীত অপর প্রসঙ্গে কদাচ কোন কথা বলে না।

অতি প্রত্যূষে শঙ্করা আমার নিদ্রাভঙ্গ করে ও চা আনিয়া নাকের ঠিক নীচেই ধরিয়া তদ্গন্ধে জাগরণ সুসম্পন্ন করে। তৎপরে সে আমার দৈনিক কাগজগুলি আনিয়া টেবিলে রাখে, স্নানের জল ঠিক করে, "বেলা হইল" বলিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে ও

আফিসের গাড়ীতে আমার খাতাপত্র পোর্টফোলিও হ্যাণ্ডব্যাগ সব গুণিয়া তুলিয়া দেয়। আফিস হইতে ফিরিলে শঙ্করা আমার ছাড়া পোষাক ভাঁজ করিয়া রাখে, কোন পকেটের নিরালা কোণে ব্যাগভ্রষ্ট খুচরা রেজকি বা পয়সা থাকিলে আত্মসাৎ করে ও সান্ধ্যভোজন ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। শঙ্করা গৃহে বন্ধু-সমাগম হইলে যাতুকরের স্থায় অসম্ভব উপায়ে দুষ্প্রাপ্য খাদ্যদ্রব্যাদি আহরণ করিয়া আনে, তাসের প্যাকেট সরবরাহ করে ও নিকটস্থ স্বদেশবাসীর বিপণিজাত তাম্বূল-সম্ভারে আসর ভাসাইয়া দেয়।

আমি নিষ্পত্নীক আইবুড়ো, বয়স অল্প, বেতন অধিক। একান্নবর্ত্তী নহি, সুতরাং গৃহে একান্ন জন নিকর্ম্মা লোক বসিয়া অন্ন ধ্বংস করে না। আমার গৃহে যে শঙ্করার স্থায় ভৃত্য বসবাস করিবে ইহা তেমনই স্বাভাবিক যেমন স্বাভাবিক অল্পস্রোত নদীতে কচুরি-পানা, অল্পবুদ্ধি লোকেতে ভার্য্যা ও অকালপক্ব বালকের মুখে জ্যাঠামি বা বিড়ি।

এ-হেন শঙ্করা একদা ছুটি লইয়া কোথায় যেন গমন করিল। যাত্রা-কালে প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় যাচ্ছিস, কবে আসবি ?"

উত্তরে শঙ্করা বলিল, "ঘর যাইব, ঝটিতি আসিব ; হুজুর, বদলি দিল কাজ করিবি।"

বদলি অপর এক জন উড়িয়া, শঙ্করার গুণগুলির কোনটিই তাহার নাই, দোষের ভাগ কিছু অধিক। কিছু কাল তাহার অত্যাচার সহ্য করিলাম। অবশেষে এক দিন আমার সাধের মিলিটারি চুলের বুরুষ দিয়া নিজ টিকি আঁচড়াইতে দেখিয়া তাহাকে কান মলিয়া গৃহের বাহির করিয়া দিলাম।

অতঃপর একটি কাঁথিনিবাসী বাঙ্গালী ভৃত্য আসিয়া আমার গৃহে আস্তানা গাড়িল। তাহার করকমলের যাতুর সাহায্যে আমার দৈনিক অভাব কিছু কিছু কমিল বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কমিল ধুতি, পাঞ্জাবি, গেঞ্জি প্রভৃতি পরিধেয় এবং বাড়িল পান, সিগারেট ও সোডা লেমনেডের বিল। এই ব্যক্তি যে প্রকার অবাধে পরদ্রব্য নিজ অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও লোভের গহ্বরে লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করিত তাহাতে মনে হইত উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে লোকটা বড় এক জন রাষ্ট্রনেতা হইয়া উঠিতে পারিত।

আমি লোকটা কিছু শান্তিপ্রিয় ও নির্ব্বিবাদী। সেই জন্য এই মহাপুরুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহার চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার আমার প্রবৃত্তি হইত না। আর যাহাই হউক লোকটি ভদ্র ছিল। সে আমার চিরুণী বুরুষ ব্যবহার করিত না, আমার হিসাবে দোকান হইতে নিজ ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইত। আমার জামা জুতা সে সযত্নে এক পার্শ্বে রাখিত ও আমার খরচে প্রস্তুত নিজের কাপড়-চোপড় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। সে লেখা পড়া কিছু কিছু জানিত এবং লম্বা লম্বা কাগজের ফালিতে ইংরেজীতে তারিখ ও বাংলায় হিসাব লিখিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিত—পয়সা আদায় করিবার জন্য। আমি হিসাব না দেখিয়াই তাহাকে অর্থ দান করিয়া মুক্তি লাভ করিতাম। লোকটা আমার শঙ্করার অভাব কথঞ্চিৎ দূর

বন্ধু-বান্ধবের সমক্ষেই অর্দ্ধচৈতন্ত অবস্থায়…"দাদা, দাদা" বলিতে বলিতে বলিতে আমার ক্রোড়ে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

করিয়াছিল। তার নাম ছিল চৈতন্য, কিন্তু এক দিন যখন সে সন্ধ্যাকালে মদ খাইয়া আমার অনেকগুলি বন্ধু-বান্ধবের সমক্ষেই অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় টলিতে টলিতে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া আধ আধ কণ্ঠে "দাদা, দাদা" বলিতে বলিতে আমার ক্রোড়ে আসিয়া বসিয়া পড়িল ও হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন তাহাকে ঘাড় ধরিয়া রাজপথে নিজ যথার্থ সহোদরের সন্ধানে বাহির না করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় আর রহিল না।

তার পর আসিল রাখাল। বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। বেজায় 'পেট্রিয়ট'। দিন কয়েক কাজ করিয়া এক দিন বিরুদ্ধ আদেশ সত্ত্বেও স্বদেশী দিয়াশলাই আনিয়া দিয়া আমার পকেটে আগুন ধরাইয়া দেওয়ার জন্য তিরস্কৃত হইয়া সে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আপনার মত লোকেদের জন্যই এ দেশের এ দুর্গতি" এবং সঙ্গে লইয়া গেল আমার একটি সুইস-মেড হাত-ঘড়ি, একখানা রোজার্সের ছুরি ও এক বাক্স হাভানা সিগার।

শঙ্করা না থাকায় বাড়ীখানা যেন বিশ্বের চোর জোচ্চোর ও অকর্ম্মার ওয়েটিং রুম হইয়া উঠিয়াছে। কেহ আজ আসে, কাল যায়, সঙ্গে লইয়া যায় কিছু। কাল অপর কেহ আসে—সেও তদ্রূপ। অর্থাভাব নাই, যৌবন আছে তাই এ সকল যন্ত্রণার ভিতরেও বাঁচিয়া আছি; এমন কি স্বচ্ছন্দে খাই-দাই, আড্ডায় বসি ও ঘুমাই।

৩

সকাল বেলা। ঘুম হইতে উঠিয়াছি কি উঠি নাই ঠিক বলা যায় না। বাহিরে টেরিয়ার কুকুরটা বিকট রবে কাহাকে যেন খেঁকাইয়া উঠিল, কে যেন পরিচিত স্বরে কি বলিল, কুকুরটাও চুপ করিল। চেনা ধরণের পায়ের আওয়াজ, রেওয়াজ মত দরজায় টকটক করিয়া ঘা দিয়া কে যেন ঘরে ঢুকিল। চোখ চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময় যেন স্থূলত্ব লাভ করিয়া কামারের হাতুড়ির মতই আমার মস্তকে ধাঁই করিয়া পতিত হইল।

দুর্গা, দুর্গা! হরি হরি! রাধা মাধব!

শঙ্করা আসিয়াছে, কিন্তু এ কি ভীষণ দৃশ্য! তাহার মস্তকে ফেজ, পরণে লুঙ্গি এবং 'হে ভগবান এ কি দৃশ্য!'-মুখের উপর তাহার ঘন কৃষ্ণ দাড়ি। তাহার সেই ঘোর কৃষ্ণ স্থূলাধরোষ্ঠ কুতকুতে-চক্ষু বদনচন্দ্রের উপর ভাল্লুকের মস্তকে মুকুটের ন্যায় ফেজ-ক্যাপ শোভমান। আর তাহার সে দাড়ি! সে দৃশ্য আমরণ আমার মানস-ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিবে যেন আঁস্তাকুড়ের গায়ে ফণীমনসার ঝাড়। কি রকম একটা দারুণ ক্রোধ আমায় সহসা আক্রমণ করিল বলিতে পারি না। এতটা বিস্ময়ের

কম সম্ভবত। হাঁকিয়া উঠিলাম, "শূয়ার কাহাকা, সকালে এসেছিল বহুরূপী সেজে তামাসা করতে! বেরো বাড়ী থেকে এখনি, নইলে জুতিয়ে হাড় ভেঙে দেব।"

তাহার মস্তকে ফেজ, পরণে লুঙ্গি

শঙ্করা আমার পায়ের কাছে সটান শুইয়া পড়িল ও আর্ত্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "হুজুর মা বাপ, বহুরূপী হইবি কি, হুজুর, মুসলমাড় হইল।"

আমি বলিলাম, "সর্ব্বনাশ! সে কিরে ব্যাটা, মুসলমান হ'তে গেলি কেন? বামুনের ছেলে, এ রকম ভূতে ধরলে তোকে কি ক'রে?"

শঙ্করা কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম, যে তাহার বড় একটা দোষ নাই; সে একে উড়িয়া তায় অল্পবয়স্ক এবং কায়দাদোরস্ত। ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবে বলিয়া

সে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ট্রেনে কথায় কথায় এক বৃদ্ধ মুসলমান ও তাহার নাতিনীর সহিত পরিচয় হওয়াতে খড়্গপুরে নামিয়া পড়ে। বৃদ্ধ তাহার আদব-কায়দা ও কথাবার্ত্তায় খুবই সন্তুষ্ট হয় এবং প্রস্তাব করে যে, শঙ্করা যদি ঘৃণ্য কাফের-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পবিত্র এছলাম-ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার সদ্য-যৌবনা নাতিনীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে পাইতে পারে। যে-প্রেম ক্ষণিকের জন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভূব মহাদেবকেও অভিভূত করিয়াছিল, যে-প্রেম মহৎবংশজাত নৃপতি-তনয়কে ধীবর-কন্যার অনুগ্রহ ভিক্ষা করাইয়াছে, যে-প্রেমের তাড়নায় অনন্ত জ্ঞানের আধার শ্রীকৃষ্ণও আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, যে-প্রেমে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের সহিত রাক্ষস-দুহিতা হিড়িম্বার মিলন হইয়াছিল, যে-শক্তির ব্যাখ্যানে শত সহস্র কবি আত্মনিয়োগ করিয়াছে ও যাহার পূজায় জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিক নিযুক্ত, আমার অশিক্ষিত গরিব বেচারা ভৃত্য শঙ্করা সেই প্রেমেরই ধাক্কায় টাল সামলাইতে না পারিয়া অপর ধর্ম্মের গহ্বরে পতিত হইয়াছে। ইহাতে তাহার দোষ কি? রূপবতী যুবতী নায়িকার আকর্ষণে কত শত অতিমানব সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে—এক জন উড়িয়া ব্রাহ্মণ তাহার জন্য ধর্ম্মত্যাগ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যাহার প্রভাবে মানব-হৃদয়ে নিত্য নূতন ভাব, ব্যাকুলতা, বিরহ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা, অকারণ চাঞ্চল্য, ক্রন্দনেচ্ছা, আত্মঘাতেচ্ছা আরও কত কি সতত দ্রুত গজাইয়া উঠে, তাহার প্রভাবে যে এক জন নিরক্ষর অল্পবুদ্ধি উড়িয়া ভৃত্যের মুখে দাড়ি গজাইবে ইহাতে অভাবনীয় কি আছে? যে মিলনাকাঙ্ক্ষার ধাক্কায় মানবের হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইয়া অধরোষ্ঠে আসিয়া সংলগ্ন হয়, ক্ষুধা মাথায় উঠে, চক্ষু কপালে উঠে, তাহা যে এক উড়িয়ার মস্তকে একটা বিদেশীয় টুপি উঠাইবে তাহাতেই বা অসম্ভব কি আছে?

আমি বলিলাম, "শঙ্করা,………"

শঙ্করা বলিল, "হুজুর, শঙ্করা নাম ছাড়ি দিলা; নূতড় নাম হারুড়্‌ল-রসিদ হইল।"

আমি চটিয়া বলিলাম, "ব্যাটা, তবে তোর চাকরি গেল; হারুণল-রসিদ কি জাহাজীর বাদশা! ইতে চাস তো তোর খড়্গপুরের বিবির কাছে ফিরে যা। এখানে তোর জায়গা হবে না।"

শঙ্করা মুসলমান হইলেও হৃতবুদ্ধি হয় নাই। সে দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "হুজুর, হারু বলিবে আমাকে।"

আমি দেখিলাম, তাহাতে দোষ নাই। তা ছাড়া আমার অত মুসলমান-বিদ্বেষও নাই। চাকর হইলেই হইল, তার পর সে নমাজ পড়িয়া চুরি করে অথবা গায়ত্রী আওড়াইয়া চুরি করে তাহাতে আমার যায় আসে না।

হারু আমার গৃহে আবার মোতায়েন হইল। সবই ঠিক আগের ন্যায়, শুধু তফাৎ পোষাকে ও দাড়িতে। পূর্ব্বে শঙ্করা কোন অত্যধিক রকম চুরি কি ঠকামি করিলে যদি

আমি কোন প্রকার তিরস্কার করিতাম তাহা হইলে পৈতা হস্তে মিথ্যা কথা বলিয়া সে নিজের সততা প্রমাণ করিত। এখন সে কথায় কথায় আল্লা ও কোরাণ শরীফ সাক্ষী করিয়া নিজের অন্যায়গুলিকে ন্যায় করিয়া তুলিত।

তাহার যে কোন পরিবর্তন হইল না তাহা নহে। সে নিজের পুরাতন বন্ধুবান্ধবদিগকে ত্যাগ করিয়া এক দল বিড়িওয়ালার সহিত জুটিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে 'এই উড়িয়া' বলিয়া ডাকিত কিন্তু অপর সকল বিষয়ে নিজেদের সহিত একভাবেই দেখিত। শুধু এক দিন শুনিয়াছিলাম হারু কাহাকে গালি দিয়া বলিতেছে, "শড়া, অড়েয়া অছি তো হইবি কি? তোর বাপর কি, তুর কি? শড়া, তোর আপড় বাপ চমার থিলি।" বুঝিলাম আভিজাত্যলোভী কোন অনির্দ্দিষ্ট দেশী বিড়ি কিম্বা গাড়ীওয়ালার সহিতই হারু যুঝিতেছে; এইরূপ দ্বন্দ্ব কিন্তু আমার জ্ঞানে আর হয় নাই।

৪

হারু দিন কতক হইতে কি-রকম যেন উসখুস করিতেছিল। একবার বলিল, "খড়্গপুর যাইব।" তাড়া দিয়া বলিলাম, "ব্যাটা, এই সে দিন পাঁচ রাত্রি কাটিয়ে এলি তোর শ্বশুরখানামে আবার যেতে চাস, লজ্জা নেই? যাস তো একেবারে যাবি।"

হারু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "বেমারী......"

আমি ধমক দিয়া বলিলাম, "চুপ রও। যায়েগা তো এক পয়সা তলব নাহি মিলেগা, আউর জুতি মারকে জান লে লেগা। পুলিসমে দেগা, জাহেল যায়গা আউর কুত্তাসে কাটায়গা, আউর···" আর কিছু ভয় দেখাইবার মত না পাইয়া বলিলাম, "আউর তুম চুপ রও একদম।"

আমি হিন্দী বলিলে হারু সত্যই ভয় পাইত। সে আর কিছু না বলিয়া বিড়বিড় করিয়া 'খোদার কশম' না কি আওড়াইতে আওড়াইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আফিস যাইবার সময় দেখিলাম ভীতচক্ষে সে একখানা পোষ্ট কার্ডের দিকে চাহিয়া আছে, সম্ভবত ঘামিতেছেও।

৫

আফিস হইতে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম সে এক বিরাট অভিনয়। আমার বাড়ির গেটের এক পার্শ্বে কতকটা জায়গা পড়িয়াছিল। সেখানে বহু লোকসমাগম হইয়াছে। সকলেই পরস্পরকে কি সব বলিতেছে। প্রায় সকলেই উড়িয়া এবং এক আধ খণ্ড সীসার পাইপ অথবা কোন পাইপ মেরামত-সংক্রান্ত হাতিয়ার হস্তে। জনসঙ্ঘের মধ্যপ্রদেশ

হইতে একাধিক বামাকণ্ঠের তীব্র কাংস্যধ্বনি মুহুর্মুহু উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকের আবহাওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কে যেন আর্ত্তনাদ করিতেছে ও কাহারা যেন পরুষকণ্ঠে অপর কাহার উদ্দেশ্যে উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিতেছে।

আমি গাড়ী হইতে ঘাড় উচাইয়া কিছু দেখিতে না পাইয়া দোতলায় চলিয়া গেলাম। সেখানে একদিকের বারান্দা হইতে ঘটনাক্ষেত্র অবধি চক্ষে দেখা যায়। আমি যাহা দেখিলাম তাহা ভীষণতা ও হিংসায় প্রাগ্ঐতিহাসিক, প্রাণবানতা ও প্রখরতায় বাল্মীকি, বেদব্যাস অথবা হোমারের বর্ণনার উপযুক্ত এবং নারীশক্তির অভিব্যক্তিতে দশমহাবিদ্যার একত্রাবির্ভাবের সমতুল্য।

চতুর্দ্দিকে দলে দলে সশস্ত্র উড়িয়াগণ দণ্ডায়মান। মধ্যে একটুখানি ফাঁকা জায়গা, তাহার এক পার্শ্বে এক জন উড়িয়া ব্রাহ্মণ আগুন জ্বালিয়া কি যেন করিতেছে। হস্তে তাহার এক তাল গোময় ও একটা থলিতে আর যেন কি সব রক্ষিত। অপর এক পার্শ্বে এক জন উড়িয়া ক্ষৌরকার একমনে একটি ক্ষুর শানাইতেছে। তাহার মুখে একটা নিস্পৃহ অবিচলিত হাস্যময় ভাব—যেন বলির সম্মুখে খড়্গ হস্তে পুরোহিত। মধ্যে হারু। সে কখন শূন্যে দোদুল্যমান কখন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত। তাহার উভয় পার্শ্বে তাহারই এক একটি কর্ণ ধারণ করিয়া অবস্থিত দুইটি মহিষমর্দ্দিনী সদৃশ উড়িয়ানী। বিভীষণা বিকটদশনা সেই নারীদ্বয়ের কবলে হারু বিড়ালের মুখে নেংটি ইঁদুরের ন্যায় নিস্তেজ ও নির্জ্জীব। তাহাকে উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয় কখন ঝাঁকি দিয়া খাড়া করিয়া দিতেছে কখন বা মাটিতে আছড়াইতেছে। নির্ম্মম পুরুষগণ কাতারে কাতারে অবিচলিত চিত্তে স্বজাতীয় অপর এক পুরুষের এই অবমাননা দেখিতেছে—কেহ কেহ বাহবা দিতেছে। তার পর অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হইল। মুণ্ডিতশ্মশ্রু হারু গোময় ভোজন করিয়া ও অপর প্রকার আর্থিক ও দৈহিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করিল।

স্ত্রীলোক দুই জন গর্ব্বিতমুখে নিজেদের স্থূলবপু সঞ্চালনে ভিড় ভাঙ্গিয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল। উড়িয়াগণও বিদায় হইল। রহিল শুধু কয়েকটা ছোকরা উত্তেজিত কথোপকথনে নিযুক্ত।

হারু উপরে আসিলে পর আমি বলিলাম, "হারু—"

হারু ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "হুজুর, হারুণ্‌-অল-রসিদ মরিল। আমি শঙ্করা।"

আমি বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ, এর মধ্যে তোর রাজত্ব শেষ হয়ে গেল? এখন বোগ্‌দাদের কি গতি হবে? ঐ খুনে মেয়েমানুষ দুটো কে রে?"

শঙ্করা উত্তর দিল, "আমার স্ত্রী।"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "বাবা, তোর সাহস আছে শঙ্করা! তুই অমন দুটি রেলের ইঞ্জিন ঘরে থাকতেও কোন্ সাহসে গিয়েছিলি আবার বিবি আনতে? তোর ভয় ডর নেই? এখন তোর বোখারার আমদানী খড়্গপুরের বিবির কি গতি হবে?"

বিড়ালের মুখে নেংটি ইঁদুরের ন্যায়
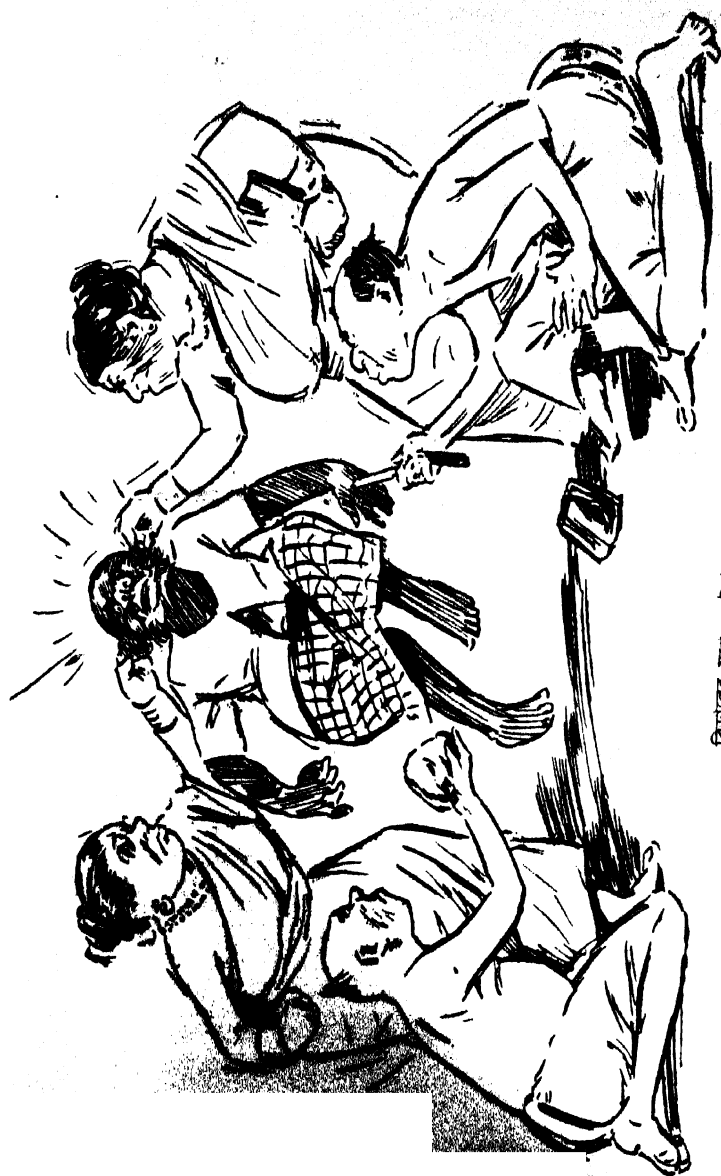
শঙ্করা ম্লান মুখে বলিল, "তালাক দিব।"

আমি শেষ প্রশ্ন করিলাম, "আর এ ব্যাটারা তোকে আবার জাতে নেবে তো। না, একুল ওকুল দুকুল যাবে তোর ?"

শঙ্করা বলিল, "নিবি না তো কি ? পয়সা দিল, শুদ্ধি হইল, নিবি না তো কি ?"

দি ন্যাশনাল সাইক্লোপিয়ান লীগ

অচ্যুতবাবু আফিসের ফিরতি-মুখে ট্রেন-টাইম হয় নাই বলিয়া একটু গা ঢিলা দিয়া চলিতেছিলেন। তিনি সকল ব্যক্তিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন এবং সকল ব্যক্তিও তাঁহাকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কারণ, অচ্যুতবাবুর দেহটি প্রমাণ সাইজের কিছু উপরে। দেহের গঠনের মধ্যে সচরাচর যে পরিমাপ-গত বৈষম্য দেখা যায়, অচ্যুতবাবুর কলেবরে সে সকলের প্রায় কোনই লক্ষণ ছিল না। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের, ঘাড় ও গর্দ্দানের, বুক ও পেটের মধ্যে যে সকল পার্থক্য অহরহ পথে ঘাটে লক্ষিত হয়, অচ্যুতবাবুর নিটোল শরীরে সে সকলের একান্তই অভাব। সার্দ্ধ চারি মণ অচ্যুতবাবু বহুবিজ্ঞাপিত আধুনিক নার্সারিজাত কোন অতি-অলাবুর ন্যায়ই পথ বাহিয়া চলিতেছিলেন, বোঁটা ছেঁড়া ফলেরও যে প্রাণ থাকে তাহারই একটি জীবন্ত প্রমাণের মত।

টাউন-হলের কাছাকাছি আসিয়া অচ্যুতবাবু অনুভব করিলেন ভিড়টা যেন একটু অধিক। কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ঘাড় নাড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া যথাসম্ভব ইতস্তত তাকাইয়া দেখিলেন, বহু লোক টাউন-হলের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। বুঝিলেন মিটিং। ট্রেনের তখনও প্রায় দেড় ঘণ্টা বিলম্ব, তাই অচ্যুতবাবু স্থির করিলেন, কিয়ৎকাল জাতীয়জীবন-প্রবাহে অবগাহন করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিয়া লইবেন। আধুনিক জীবনে মিটিং করা তীর্থ করার সামিল, ভোটযুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধের সমান। পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রাণ লোকে কীর্ত্তন করিয়া 'দশা' পাইতেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা অর্থহীন বক্তৃতা করিয়া জ্ঞান হারাইয়া সেই আদর্শ বজায় রাখেন। পূর্ব্বকালের টিকি ও বর্ত্তমানের গান্ধী-ক্যাপ, পূর্ব্বের উপবীত ও বর্ত্তমানের খদ্দর, পূর্ব্বের কাশীবাস ও এখনকার জেলে বাস ইত্যাদি অপরাপর সাদৃশ্যও অনেক আছে। তাই অচ্যুতবাবু ভাবিলেন, আফিসের দাসত্বপাপ টাউন-হলের অদম্য স্বাধীনতার স্রোতে কথঞ্চিৎ ক্ষালন করিয়া লইবেন। কিন্তু হায়, এ প্রতিযোগিতার যুগে পুণ্য করিতে হইলেও না বুঝিলে চলে না। টাউন-হলে যত লোক ধরে তাহা অপেক্ষা অধিক লোক তথায় প্রবেশ করিতে চাহিলে কাহাকেও না কাহাকেও যে বাহিরে থাকিতেই হইবে এ কথা কে না বুঝে! তাই ভিড়ের সহিত স্থূলদেহে কিয়ৎকাল ধস্তাধস্তি করিয়া অচ্যুতবাবু দেখিলেন যে, স্রোতের বিপরীতগামী সন্তরণকারীর ন্যায় তিনিও পশ্চাদ্ভাগে বহু দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। উচ্চ আদর্শে বিফল, ব্যর্থচিত্ত অচ্যুতবাবু অগত্যা ট্রাম ধরিয়া হাওড়ার পথে চলিলেন। ট্রেনের তখনও বিলম্ব ছিল তাই তিনি ইণ্টারের

টিকিট লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে ঢুকিলেন। যথালাভ; ওয়েটিং রুমে ক্লু-সিসটেম তখন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ঠকাইয়া ছারপোকার কামড় খাইতেও সুখ হয়।

একখানা 'মহাশক্তি' পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে অচ্যুতবাবু ঢুলিতে লাগিলেন। ঘুমন্ত চোখের সম্মুখে স্বপ্নছবি; কখন দেখিলেন যেন একটা চরখা ছোট হইতে ক্রমে বাড়িতেছে। বাড়িতে বাড়িতে সূর্য্যের পথ অবরুদ্ধ করিয়া প্রলয়ের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। সে ঘূর্ণীর পাকে পড়িয়া সৃষ্টি পেঁজা তুলার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেন কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি তাহা হইতে অনায়াসে সুতা কাটিয়া চলিতেছে। বিরাম নাই, তুলার শেষ নাই, সুতারও শেষ নাই। আবার নূতন ছবি, কে যেন বলিতেছে, "দেশের সকল ছারপোকা অরগ্যানাইজ করিয়া ইংরেজদিগের পিছনে লেলাইয়া দিলে অচিরাৎ স্বরাজ লাভ হইবে।" আর এক জন বলিতেছে, "না না, অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠতর পথ।" আবার পটপরিবর্ত্তন—অনন্ত শূন্যের বক্ষ চিরিয়া কালির বন্যা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল ও শূন্যে লিখিত হইল, "শুধু ভুল বকিয়া যাও, ভুল লিখিয়া যাও; ইংরেজী ভুল, বাংলা ভুল, হিন্দী ভুল; সকল ভাষা ভুলের ভেজালে এমন হইয়া উঠিবে যে, ইংরেজ পিতৃনাম বিস্মৃত হইয়া মস্তকে ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া এ দেশ ত্যাগ করিবে। শরীরে কাবু করিতে না পারিলেও ইংরেজকে মস্তিষ্কে কাবু করিতে আমাদের বেশীক্ষণ লাগিবে না।" অচ্যুতবাবু শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মন প্রাণ যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। পৃথিবীতে কখন কখন আপনা হইতে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া যায় যাহার

প্রথম মিলন

ফল বহু দূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় অথচ তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে কোন বিধিব্যবস্থা দেখা যায় না। এই সকল মহা মহা আকস্মিক ঘটনার কারণ গ্রহবৈগুণ্য ব্যতীত আর

কিছু বলিতে আমরা পারি না। অচ্যুতবাবু দেখিলেন তাঁহার অজ্ঞাতকালে আরও পাঁচ জন লোক ওয়েটিং রুমে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আয়তনে অচ্যুতবাবুর সমতুল্য, উনিশ বিশ হইতে পারেন কিন্তু কেহই তাচ্ছিল্যের পাত্র নহেন।

আকৃতিগত বা চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকিলে মানুষ স্বভাবতই মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং অতি শীঘ্রই অচ্যুতবাবুর সহিত আনন্দবাবু, গোবর্দ্ধনবাবু, সহায়রামবাবু, চিন্তামণিবাবু ও ঘটুবাবুর বেশ আলাপ জমিয়া উঠিল। সকলেই ডেলি প্যাসেঞ্জার, সকলেই কেরানি এবং প্রত্যেকেই সকল বিষয়ে অসন্তুষ্ট। কিছু কাল নানান বিষয়ে আলাপ হইবার পর ঘটুবাবু বলিলেন, "আর মশাই, যেখানেই যাই, যত ব্যাটা সিটুকে চীৎকার ক'রে ওঠে 'ঐরে, ঐ মোটাটা আসছে, এবারে চার জনের জায়গা জুড়ে বসবে।' বলি, মোটা হয়েছি তা নিজের খেয়েই হয়েছি, তোমারও গাঁটে কড়ি থাকলে আর হজম করবার ক্ষমতা থাকলে তুমিও মোটা হ'তে।"

সহায়বাবু বলিলেন, "যা বলেছেন মশায়। এর একটা বিহিত করা দরকার। এখন দিন কাল এমন যে লোকে বোঝে না রোগা মোটার তফাৎ কি! সমস্ত জাতটা যে রোগা হ'তে হ'তে নিরাকার হয়ে যাবার পথে চলেছে তা কি কেউ বোঝে? ৩৫১৩ সন নাগাদ বাবাজিদের সব মাকড়সায় গিলে খাবে, দেখবেন এখন। মোটাসোটা লোকেরা হচ্ছে প্রাচীনপন্থী। জীবনী-শক্তি আছে মশায়, তাই তো যা খাই গায়ে লাগে। তা নইলে ঐ ফুটো কাঁসার মত, এক ফোঁটা জল ধরে না অথচ খ্যানখ্যানানির চোটে দুনিয়া মাৎ, ওতে কি হবে?"

আনন্দবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে গলকম্বল সদৃশ চার থাক চিবুক তরঙ্গায়িত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এজিটেশন করা দরকার মশায়, এজিটেশন আর প্রপ্যাগাণ্ডা দরকার, তা নইলে কিছু হবে না। এ যেন রাঘব বোয়ালের বুকে কুঁচো চিংড়ি লাথি মারে! হায়রে হায়; আমরা যে ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারি।"

অচ্যুতবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। তিনি গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "তা আসুন না একটা পার্টি গড়া যাক। একথা ঠিক জানবেন, আমাদের যা পার্সোনালিটি আছে তাতে আমরা অবশ্য দেশব্যাপী একটা আন্দোলন করতে পারব। একটা নতুন ভোটনীতি খাড়া করা যেতে পারে। 'ভোট অ্যাকর্ডিং টু ওয়েট' অর্থাৎ কিনা যে মানুষের ওজন যত তাই দেখে তার ভোট তত কম বেশী হবে। এক মণ ওজন এক ভোট, দু মণ দু ভোট, তিন মণ তিন ভোট এই রকম, বুঝলেন না?"

চিন্তামণিবাবু স্বল্পভাষী লোক. বেশী কথা বলিলে হাঁপ ধরে, তিনি বলিলেন, "হুঁ হুঁ হুঁ···শুভস্য শীঘ্রম্···হুঁ হুঁ হুঁ।"

আনন্দবাবু বলিলেন, "ঠিক বলেছেন, বাঙালীর ব্রেন, একটা ড্রাফ্‌ট কন্সটিটিউশন খাড়া ক'রে ফেলে এক দিন প্রভিন্সিয়াল মিটিং ক'রে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলা যাক আর কি? দেরি ক'রে লাভ কি?"

কথায় বলে যে জিনিষ যত অল্পক্ষণ জলন্ত থাকে তাহাতে আগুন ধরে তত শীঘ্র, আর তাহার প্রথম হলকা তত প্রবল হয়। যেমন খড়ের গাদার আগুন আর কয়লার গাদার আগুন। একটা দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে আর চট করিয়া নিভিয়া যায় আর অপরটি ধরিতে সময় লাগিলেও জ্বলে বহুক্ষণ ধরিয়া। আমাদিগের ষড়-বিপুলের উৎসাহ ঠিক বাংলার রেওয়াজ মত হঠাৎ এবং প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। মেন লাইন, নিউ কর্ড ও বি এন আরের বিভিন্ন ট্রেন ধরিয়া উপরোক্ত ছয় মহাপুরুষ গৃহগামী হইবার পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গেল যে, অবিলম্বে 'দি ন্যাশনাল সাইক্লোপিয়ান লীগ' নাম দিয়া এই বিরাট সঙ্ঘের পত্তন করা হইবে।

২

অচ্যুতবাবু, ঘটুবাবু প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল যে শেষ অবধি তাঁহাদের লীগের ব্রাঞ্চ ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন; কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু বাংলা দেশে তাহার কার্য্য

অতিকায়-সঙ্ঘের শহর প্রদক্ষিণ

চালাইবেন স্থির করিলেন কারণ বাংলা দেশে বৃহদায়তন জমিদার, উকিল, আফিসের বড়বাবু, দালাল, উত্তমর্ণ প্রভৃতির অভাব নাই, এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের সহিত সাদৃশ্য বশত উক্ত আকৃতির লোকেরা সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র না হইলেও আকর্ষণের বস্তু অবশ্যই বটে। অচ্যুতবাবুরা এক জন শেয়ারের দালালের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার টেলিফোনটা ব্যবহার করিবার অনুমতি লইলেন। তাহার বাড়ির দরজায় একটা সাইন বোর্ডও লাগাইলেন। তাহারই বৈঠকখানায় তাঁহাদের ছয় জনের একটা

বিরাট সভা হইল। সভায় স্থির হইল যে, যেহেতু শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে বাংলা দেশের অতিকায় ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি অপরাপর মণ্ডলীর ও সম্প্রদায় সমূহের উন্নতির সহিত একাভিমুখী নহে, সেই জন্য উক্ত অতিকায় ব্যক্তিগণ সভাস্থ হইয়া স্থির করিতেছেন যে, প্রথমত, সরকার বাহাদুরকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে 'ন্যাশনাল সাইক্লোপিয়ান লীগ' একটি বিশেষ সম্প্রদায়; দ্বিতীয়ত, সরকার বাহাদুরকে উক্ত সম্প্রদায়ের সভ্যবর্গের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ ও ভোট দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে (ওজন অনুপাতে ভোটের সংখ্যা কম বেশী হইবে এই আদর্শের পত্তন ঐ সভা আকাঙ্ক্ষা করেন); তৃতীয়ত, অতিকায় ব্যক্তিদিগের জন্য সরকার বাহাদুরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যথা—(১) রেলগাড়ীতে তাহাদিগের জন্য বিশেষ কামরা নির্দ্ধারণ করা। সেই সকল কামরাতে 'টু সিট সিক্সটিন' না লিখিয়া 'টু সিট ফোর' (অথবা ঐ অনুপাতে) লিখিতে হইবে। সেই সকল কামরার দরজা দ্বিগুণ চওড়া করিতে হইবে। (২) সকল সরকারী আফিসে অতিকায়দিগের জন্য লিফ্‌টের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) ট্রামে ও বাসে অতিকায়দিগের জন্য অতিরিক্ত চওড়া সীট দিতে হইবে……ইত্যাদি ইত্যাদি।"

'মহাশক্তি' আফিসে এক জন ইতিহাসে এম. এ. পাস ছোকরা পোলিটিক্যাল নোট্‌স লিখিত। তাহাকে কিছু সাকার ও নিরাকার আপ্যায়ন করিতেই সে এই বিরাট সভার একটা বিরাটতর রিপোর্ট বিরাটতম হেডিং-টাইপ দিয়া ছাপাইয়া দিল। মহাশক্তি এই সভার অধিবেশনের রিপোর্ট ছাপাইয়া নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিল—

"পথের কাঁকর মাথা তুলিয়া গৌরীশঙ্করের মস্তকে পদাঘাত করিবে সে দিন আর নাই। হিমাচল আজ জাগ্রত, বিপুল, বিরাট, ভয়ঙ্কর, দুর্ব্বার নির্ঘোষে আজ আপনার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করিতেছে। হায় নিয়েনডারথল মানব! ক্রোম্যাগ্‌নন্‌নের প্রাণশক্তি আজ মূর্ত্ত অতিকায়রূপে তোমাকে 'মেজরিটি মাষ্ট বি গ্রান্টেড'-লীলার অবদানের পর্য্যায়ে প্যালিওলিথিক প্রবলতার সহিত নিক্ষেপ করিবে। সাইক্লপ মাথা তুলিয়াছে, পর্য্যস্ত শিকল টুটিয়া আজ তাহার হাতের অস্ত্র। ঘূর্ণীর পাক শাশ্বত অকর্ম্মণ্যতার অসংখ্য নিষ্ক্রিয়তার ফলহীন কুঞ্জে লাগিয়াছে। মহাদেব তাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ। ঝড়ের উদ্দামতা আর ছিন্ন পত্রের অনন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রা—এর শেষ কোথায়?"

মহাশক্তির ইংরেজী সংস্করণ—'হাউইটজার' পত্রিকায় উক্ত ঐতিহাসিক যুবক প্যারাগ্রাফ লিখিল—

"The pebbles cramming the breast of the path lifts no more its head kicking the head of the mount Everest. Where is that day? The Mount Himalayas have arisen, awaken and is resounding its relentless voice in

the loud tone of eternal annihilation. Alas, thou Neanderthal man. The Cromagnon man rushes out with the life power personified and is casting you in the depths of the end of majority must be granted with true palaeolithic potency. The cyclop has lifted its head, the mountain head is broken by its weapon. The cyclone has touched the bower of beginningless inefficiency and callow fruitlessness. The God Mahadev is dancing *Tandab*. The madness of the storm and the objectless motion of decapitated tree leaves. Where is its end ?

সর্ব্বত্র, মেসে, মাঠে, আফিসে, বাজারে সাড়া পড়িয়া গেল যে বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা নবশক্তি উদ্ভূত হইয়াছে। তার পর অচ্যুতবাবুরা এক হাজার ভলাণ্টিয়ার ও সাড়ে সাত লক্ষ টাকার জন্য একটা প্রাণস্পর্শী আবেদন করিলেন। এক হাজার ভলাণ্টিয়ার গিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে যে, দেশ স্বাধীন করিতে হইলে আরও অধিক ঘী খাওয়া প্রয়োজন; কারণ সমগ্র জাতি যদি ওজনে দ্বিগুণ হইতে পারে তাহা হইলে তাহার শক্তিও দ্বিগুণ হইবে। আনন্দবাবু একটা বক্তৃতায় বলিলেন, " 'এ নেশন মার্চ্চেস অন ইট্‌স ষ্টমাক' সুতরাং ষ্টমাক বাড়াও নতুবা মুক্তি নাই।" ঘটুবাবু বলিলেন, "আমরা যেন বিদেশী বণিকদিগের সম্মুখে সত্যই পর্ব্বতের ন্যায় বিরাট অটলভাবে দাঁড়াইতে পারি।" সহায়বাবু বলিলেন, "ইংরেজগণ আমাদিগের দেশে আছে খাবার লুঠ করিবার জন্য। আমরা যদি পূর্ব্বাহ্ণেই সকল খাবার গলাধঃকরণ করি তাহা হইলে লুঠের মাল মশলার অভাবে ইংরেজ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে।" চিন্তামণিবাবু কাশিতে কাশিতে উঠিয়া এক সভাতে বলিলেন, "হু...হু...হু...সকলে সমান মোটা হ'লে...হু...হু... আর ভেদাভেদ থাকবে না...হু...হু...সব ভাই এক ঠাঁই...হু...দূরে কেউ যাবে না।"

এক দিন সকলে পতাকা প্রভৃতি লইয়া একটা লরি করিয়া শহর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। —তারিখের হরতালের পর বহু কাল এত ভিড় কলিকাতার রাজপথে হয় নাই। যেখানেই তাঁদের লরি উপস্থিত হইল সেখানেই যেন শহর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে বলে, "ঐ, ঐ।" বটুবাবু সহায়বাবুকে বলিলেন, "শুনছেন কি রকম, 'জয় জয়' ব'লে চীৎকার করছে সকলে!"

৩

বিরাট আমার, বিপুল আমার, আমার মাংস আমার মেদ,
দূর ক'রে দাও ভারত হইতে রোগা মোটা সরু স্থূলের ভেদ।
এ দীন দিবসে ফুকারি ডুকারি, 'কোথা গেল হায় চতুর্ব্বেদ'!
মহাভারতের অর্জ্জুন আর করে নাকো আজ লক্ষ্যভেদ।

আঠার পুরাণ খাড়া কর ফের প্রাণপণে ফেলে মাথার স্বেদ,
বিরাট বিরাট লেখ গো কেতাব দূর ক'রে শত চুটকি-ক্লেদ।
বিরাট আমার, বিপুল আমার, আমার মাংস আমার মেদ,
স্বাধীনতা পাবে হ'লে অতিকায় পরাধীনতায় পূর্ণচ্ছেদ॥

গোবর্দ্ধনবাবু সাইক্লোপিয়ান পার্টির গাইয়ে লোক। তিনি যখন তাঁর বাষট্টি ইঞ্চি ছাতিখানা ফুলাইয়া সত্তরের কোঠায় লইয়া গিয়া উপরের গানটি গাহিতেন, তখন সভাস্থ সকলের অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইত। তার পর একে একে জাতীয় অতিকায়-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ নিজ নিজ বক্তব্য অতিকায়োচিত ভাষায় বলিতেন। একটা সভার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল। ইহা হইতে সাধারণত অতিকায়-সঙ্ঘের মিটিং কি ভাবে হইত তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাঠকের হইবে।

[স্থান—অ্যালবার্ট হল। কাল—অপরাহ্ণ। পাত্র—অধিকাংশই শ্রোতা। কয়েকজন মাত্র বক্তা ডেইসের উপর আসীন, তাঁহাদের সকলেরই আকার অতিকায়। হলের নানাদিকে স্থূলকায় যুবক ও ভলান্টিয়ারবৃন্দ বিদ্যমান, তাহাদের কোমরের ক্রশ-বেল্ট মেদের খাঁজে অদৃশ্যপ্রায়। দেয়ালে বিভিন্ন প্রকারের পোষ্টার ঝুলান রহিয়াছে, তাহাতে স্থূল ও কৃশের পার্থক্য নানা প্রকারে দেখান হইতেছে। কোন পোষ্টারে একটি অতিক্ষুদ্র মানবের পার্শ্বে একটি অতিকায়ের চিত্র ; সঙ্গে লেখা, "কাহার ন্যায় হইতে চাও ?" অপর চিত্রে এক জন লোক নানান উপকরণ লইয়া বসিয়া ভোজনে ব্যস্ত ; তাহার নিম্নে লিখিত "স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রকৃত পন্থা।" তৃতীয় এক পোষ্টারে দেখান হইতেছে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কত লোক স্থূলকায় ছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সাহায্যে স্থূলত্বের মূল্য বুঝাইবার জন্য অপর দুইটি পোষ্টারে ঘটোৎকচের কুরুকুল ধ্বংসের ও কুম্ভকর্ণের মহাযুদ্ধের চিত্র দেখান হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। পাতলা রেশম অথবা কার্পাস বস্ত্রের স্থূলত্ব অতিকায় সঙ্ঘের আদর্শ বিরুদ্ধ বলিয়া মোটা কিংখাব ও মখমলের দ্বারা তৈয়ারী বহু রং বেরঙের পতাকা চারিদিকে ঝুলান হইয়াছে। সভা গমগম করিতেছে। সঙ্গীত সবে শেষ হইয়াছে]

সভাপতি [নূতন সভ্য ঝুনঝুনিয়া পাটকলের বেনিয়ান ; নূতন ওজন-কেন্দ্রিক ভোট-নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে সাত ভোটের অধিকারী হইবার আশা রাখেন] বলিলেন, "সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমরা যে মহান ব্রত উদ্‌যাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাহার উপর আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, মরণ বাঁচন, অগ্র পশ্চাৎ, দারা পুত্র পরিবার সকল-কিছুই নির্ভর করিতেছে। এর জন্য আমাদের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, আমলকী হরতাল অট্টালিকা, স্বার্থ পরার্থ পরমার্থ, ধনাঢ্য আঢ্য সকল-কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে। এরই অনুপ্রাণনায় উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে ঈশানে নৈর্ঋতে

বায়ুতে অগ্নিতে উর্দ্ধে অধে ধাইয়া চলিতে হইবে। রৌরব কুম্ভীপাক পুন্নাম, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য, উনপঞ্চাশ প্রাবল্যকে ভয় না করিয়া আগুয়ান হইলে তবেই লভ্য পাই আমরা। চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়, দধি দুগ্ধ ঘৃত, ক্ষীর সর নবনী, রূপ রস গন্ধ স্পর্শের পথেই আমাদের মুক্তি।" (ঘন ঘন করতালি) অজানুলম্বিত বাহু মহামেদ লম্বোদর আমরা, আমরাই ভারতের আশার স্থল। (সঘন করতালি ও সভাপতিত্বির আসন গ্রহণ)"

চিন্তামণি বাবু।—"হু···হু···হু···মুক্তি···হু··· হু··· ।"

এক জন কৃশকায় ব্যক্তি স্নায়ুচাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কি বলিতে যাওয়ায় তাহার স্কন্ধে তৎক্ষণাৎ দশ জোড়া মহাভুজ ন্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। অচ্যুতবাবু যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মিটিঙে উদ্দাম ব্যবহার অতিশয় জঘন্য। এই যে কৃশকায় ছোকরাটি অতিকায়-সঙ্ঘ সম্বন্ধে নিজকল্পনা-প্রসূত বিদ্বেষ বশত বিসদৃশ আচরণে মিটিঙের পবিত্র আবহাওয়া কলুষিত করিল, ইহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি কিন্তু ইহার যেন প্রাণে অনুতাপ জাগ্রত হয়।" (ঘন করতালি)

দুন্দুভি ঘটক নামক নবলব্ধ পার্টি হুইপ মহাশয় মত্ত মাতঙ্গ গতিতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া ইহার উহার কানে ফিসফাস করিয়া নানা কথা বলিয়া সঙ্ঘের সলিডারিটি রক্ষা করিতেছিলেন। আরও চার পাঁচ জন বক্তৃতা দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল এবং মিটিঙের রিপোর্ট ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার জন্য সঙ্ঘের বড় বড় নেতাগণ চিন্তামণিবাবুর বাড়িতে ডিনারে জড় হইবার জন্য রওয়ানা হইলেন।

৪

বাংলায় যেন একটা নূতন যুগ আরম্ভ হইল। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে জাতীয় অতিকায় সঙ্ঘের আদর্শ ও জীবনযাত্রা প্রণালী ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দেশ-ব্যাপী একটা বিরাট অ্যান্টি-কৃশতার বান ডাকিয়া গেল। রোগা ছিপছিপে লোকে আর চাকুরি পায় না, সমাজে আদর পায় না এমন কি বিনা পণে বিবাহ করিতে পর্য্যন্ত বাধ্য হয়। কৃশকায় লোকেরা সর্ব্বত্র অপদস্থ হইতে লাগিল। বহু লোকে উপরের জামার অন্তরালে মোটা তুলার জামা পরিয়া নকল স্থূলতার অত্যাচারে গরমে ঘামিয়া পচিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে লাগিল। কাউন্সিলে প্রসিদ্ধ বক্তা অতিরঞ্জন তালুকদার কৃশতা নিবন্ধন সভাপতিত্বের যুদ্ধে সাড়ে ছয়মণি কাউন্সিলার অলিফান মিঞার কাছে পরাস্ত হইলেন। অলিফান সহি করিবার ক্ষমতার অভাবে টিপ সহি মারিয়া নিজের উচ্চ পদের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

ইহা ব্যতীত সাহিত্যে, শিল্পে, শিক্ষায় সর্ব্বক্ষেত্রে এই অতিকায়-নীতির ঢেউ পৌঁছাইল। সরকার বাহাদুর যদিও ঠিক প্রকাশ্যে 'ভোট একর্ডিং টু ওয়েট'-পন্থা মানিয়া লইলেন না তবুও সকলেই বলাবলি আরম্ভ করিল যে অনতিবিলম্বেই দেশের কৃশ মেজরিটি বহু ভোটধারী অতিকায় মাইনরিটির দ্বারাই শাসিত লইবে। সাহিত্যে কৃশতাবাদ, টিউবার-কিলোসিসবাদ, চন্দ্রালোকপানবাদ প্রভৃতি উঠিয়া যাইবার জোগাড় হইল। তরুণ প্রেমিক প্রণয়িনীকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল—

মত্ত হস্তিবৎ প্রিয়ে, তোমার বিহনে
নিরাশা-দ্রুহের মূলে খুঁড়ে মরি মাথা ;
হৃদয়-কটাহে ফুটমান ইক্ষুরস সম
উন্মাদিনী প্রেমজ্বালা গাঁজিয়া উঠিছে
সদা। ইত্যাদি—

ইংরেজী শিক্ষিত নায়িকা নায়ককে আর "ওগো হৃদয়-কুঞ্জের বুলবুল" কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু বলিয়া সম্বোধন করিতে রাজী হইলেন না। কেহ কেহ "হে প্রেমসমুদ্রের ক্যাচালট হোয়েল" কিম্বা, "ওগো আমার প্রাগৈতিহাসিক মর্ম্ম-বনানীর ম্যাষ্টোডন" লিখিয়া প্রাণের আবেগ চরিতার্থ করিলেন। শিল্পে স্থূলের আদর বাড়িতে লাগিল। জমিদার পুত্রগণ গ্রে হাউণ্ড পোষা ছাড়িয়া দুম্বা মেষ শিকলে টানিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। স্কুলে "ফ্যাটেষ্ট বয়" প্রাইজের উদ্ভাবনা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও স্থূলতম ছাত্রের জন্য বিশেষ জলপানির চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এহেন সময়ে, যখন বাংলার আকাশে অতিকায় সূর্য্য প্রখরতম তেজের সহিত দেদীপ্যমান, তখন আর একটা বিপদ ঘনীভূত হইয়া ঘন কৃষ্ণ মেঘের মত সেই আকাশে দেখা দিল। কাউন্সিল ইলেকশনে জয়ী হইয়া যখন অতিকায়গণ সমগ্র বাংলার একছত্র অধিপতি তখন এক অজানিত অকল্পিত কোণ হইতে এই ভীষণ বিপদটা গহ্বর হইতে সদ্যজাগ্রত অজগরের ন্যায় বাহির হইয়া আসিল।

কিছুকাল হইতেই বাংলায় নারী-জাগরণ চলিতেছিল। "নারীকে ভোট দাও" "নারীকে পুলিস ফোর্সে গ্রহণ কর" প্রভৃতি নানা প্রকার কথা শুনা যাইতেছিল। কিন্তু আসল বিপদটা জাতীয় অতিকায়-সঙ্ঘের অ্যানুয়াল কনফারেন্সে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। সে সভার সভাপতি গণপতিবাবু অ্যাড্রেস পাঠ করিয়া ঘন ঘন করতালির মধ্যে সবে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময় সভাস্থলের প্রবেশপথে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। অচ্যুতবাবু আনন্দবাবু প্রভৃতি সেইদিকে তাকাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিলেন ভলান্টিয়ার দলের নেতা চার ভোটের অধিকারী শর্ব্বরীবদন ঘোষ একটি মহিষমর্দ্দিনী মহিলার কবলে পড়িয়া পাচিকার হস্তে কৈ-মৎসের ন্যায় ছটফট করিতেছে। অপরাপর ভলান্টিয়ারগণ

অতি-মানবিনীদিগের সভা অধিকার

কেহ কোন কথা বলিল না। শত ঐরাবত যূথের ন্যায় এই মহিলামণ্ডল [illegible]
উঠিলেন। যাহাদের সেখানে স্থান হইল না তাহারা ডেইস ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যূথনেত্রী গম্ভীর নির্ঘোষে সশব্দে টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন—

"সমবেত অতিকায় ও স্বল্পকায় নরনারীগণ! আমাদের জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। পুরুষ এতকাল বুদ্ধির দোহাই দিয়া নারীকে ও তৎসঙ্গে জগতকে উৎপীড়ন করিয়া দুনিয়া বিষময় করিয়া তুলিতেছিল। বুদ্ধিতে যখন নারী তাহাকে পরাস্ত করিল, তখন সে অতিকায়তার দোহাই পাড়িয়া নিজের গতপ্রায় প্রাধান্য ফিরিয়া পাইবার জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু পাপ যাহা তাহা কি করিয়া জয়ী হইবে? তাই আজ আমরা, বাংলার অতি-মানবিনী সভা, বলপূর্ব্বক এই সভাস্থল অধিকার করিলাম। আমরা কেহই পাঁচ অপেক্ষা কম ভোটের অধিকারী নই। আমি নিজে বর্ত্তমানে আট ভোট দাবী করিতে পারি। আমাদের পনেরো শত ত্রিশ জন সভ্যের সমবেত ওজন ৮০৩১॥ মণ; গড়-পড়তা সভ্য পিছু ওজন পাঁচ মণ দশ সের। এ অবস্থায় এই সকল চুনো পুঁটি নরকীটগণ কি করিয়া আশা করে যে, আমরা তাহাদিগকে মানিয়া চলিব? এই ইহাদিগের সভাপতি। এই তো ইহাকে আমি ধাক্কা দিয়া ডেইস হইতে নীচে ফেলিয়া দিলাম। এ আত্মরক্ষা করুক দেখি!" (চতুর্দ্দিকে ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত ধ্বনি)।

যথা কর্ম্ম তথা কাজ। মহিষাসুরমর্দ্দিনীর দুর্দ্দান্ত আক্রমণে গণপতিবাবু ধোপানী-নিক্ষিপ্ত বিরাট একটা ময়লা কাপড়ের বস্তার ন্যায় নীচে গিয়া গড়াইয়া পড়িলেন। সভাস্থল ছাড়িয়া অন্যান্য অতিকায়গণ যথাসম্ভব দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিলেন। শীঘ্রই সভায় অতিমানবিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

পরদিন 'মহাশক্তি' কাগজে লিখিত হইল—

"তুফান আর ঝড়, ঝড় আর তুফান। প্রবল শক্তিতে মাতঙ্গিনী যখন অরণ্য-গামিনী হয় তখন কে তাহাকে থামাইবে! হরিণ শিশু? না কখনও না। তাই বাংলায় আজ বান ডাকিয়াছে। কে যেন [illegible] ধরিয়া নাড়া দিতেছে। মা. মহাশক্তি জাগিলে কি? মা!"

'হাউইটজারে' লেখা হইল—

Typhoon and cyclone. Cyclone and [illegible]. When in indomitable-

their object lesson in peace. Mother of great strength have you awaken? Mother!

৫

ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়া অচ্যুতবাবু তাঁর চিন্তাকষ্ট-জর্জ্জরিত কৃশ দেহভার চেয়ারের উপর ন্যস্ত করিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা, দেশে মা বোন প্রভৃতিকে দেখিয়া কিছু দিনের জন্য সিঙ্গাপুরে গিয়া বাস করিবেন, নূতন একটা কাজ লইয়া। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ জাগিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন আনন্দবাবু, গোবর্দ্ধনবাবু,

শেষ বিদায়ের বেলা

ঘটুবাবু, চিন্তামণিবাবু ও সহায়রামবাবুও তাঁহারই ন্যায় কৃশকায় হইয়া আশে পাশে বিভিন্ন গন্তব্য স্থানের লেবেলমারা লগেজ লইয়া বসিয়া আছেন। ছয়খানি ভগ্ন হৃদয়ের যেন একগাছি মালা—শুষ্ক, ম্লান, শীর্ণ। কেহ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সবাই সকলের সব দুঃখ নীরবেই বুঝিয়া নীরবেই সহানুভূতির কারুণ্যে করুণ নয়নে শূন্য মার্গে তাকাইয়া রহিলেন।

হেদুয়া ক্লাব

[গভীর গবেষণালব্ধ ত্রেতাযুগের গল্প]

কলিকাতার হেদুয়া সরোবরের উত্তর প্রান্তে একটি রাণীগঞ্জ টালি আচ্ছাদিত চালা আছে। সেই চালার অভ্যন্তরস্থ বেঞ্চিগুলি অধিকার করিয়া সকাল সন্ধ্যা উত্তর-কলিকাতার যাবতীয় পরলোকের পথের পথিকগণ গল্প গুজব করিয়া ডাক আসিবার পূর্ব্বের সময়টুকু আনন্দে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সেদিন বৈকালেও এখানে চিরাচরিত প্রথা-মত আড্ডা বসিয়াছিল। হট ডিস্‌কাশ্যন। বিষয়—সিডিশন।

প্রমথবাবু বলিলেন, "দেখ গভর্মেণ্টের যদি বুদ্ধি থাকত তাহ'লে তারা সিডিশন থামাবার জন্য আরও গোটা কয়েক কাউন্সিল, এসেম্‌ব্লি ইত্যাদি বাড়িয়ে দিত আর তাতে ঢোকবার ইলেক্‌শনের নিয়ম-কানুন এমন ক'রে দিত যে কোন ভদ্রলোক আর তাতে ঢুকতে পারত না। তাহ'লে দেখতে যে, জাল জুচ্চুরি ক'রে যারা তাতে ঢুকত তারা এমন লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত আর এত খাটো খাটো কাজ করত যে দেশে সত্যি সত্যি রিভোলিউশন করবার মত লোক যদি কেউ থাকত তো তারা উপযুক্ত রকম বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতার অভাবে শীঘ্রই পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে মুদির দোকান খুলে দেশের দেশাত্মবোধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে লেগে যেত। সিডিশনের আসল দাওয়াই হচ্ছে উপযুক্ত ছাঁদের পলিটিক্‌স; কি বলেন মধুবাবু?" মধুবাবু কারুর মতে মত দেন না; দিলে, ভাঙের নেশা খরচা সত্ত্বেও অকালে ছুটিয়া যায়। তিনি বলিলেন, "আরে মশায়, সেও কি কথা! কাউন্সিল যত বাড়বে সিডিশনও তত বেড়ে চলবে। সিডিশন ক'রে জেলে না গেলে লোকে কাউন্সিলে ঢুকবে কিসের জোরে? অবিশ্যি বলতে পারেন যে, এতে বড় রকম সিডিশন, যেমন খুন-খারাপি, তা কমবে, কিন্তু ছোটখাট সিডিশন, যেমন কাগজে 'ইস্‌কো শীর লেও, উস্‌কো গর্দ্দান লেও' ব'লে আস্ফালন করা, কি চৌরঙ্গীর মোড়ে ফিরিঙ্গী সার্জ্জেণ্টকে লেঙ্গি মেরে ফেলে দেওয়া, এসব এতে বাড়বে। আজকালকার দিনে ঐ রকম কিছু না করলে কেউ দেশের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারে না। ধরুন না কেন, আমাদের হাতু, তার আর কি ক্ষমতা ছিল? ওবছরের ৫ই তারিখের হরতালের দিন সে গণেশ ময়রার দোকানের পিছনের দরজার ফাঁক দিয়ে জিবে-গজা কিনে খাচ্ছিল। এমন সময় 'রৈ রৈ' ক'রে সেই পথ দিয়েই ভিড় আর তার পিছনে পুলিস ছুটল। হাতু ভয় পেয়ে এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা ক'রে 'অন সাস্‌পিসন' গ্রেপ্তার হ'য়ে গেল। আর কি রক্ষা আছে! নগদ চার টাকা জরিমানা। এদিকে, হাতুর মামাবাড়ি বর্দ্ধমানে। সেখানে রাষ্ট্র

আমার তো মনে হয় সিডিশন এদেশে নেই-ই, সুতরাং তা কি ক'রে দূর করা যায় তার আলোচনা এক দিক দিয়ে নিষ্প্রয়োজন। তবে বলতে পারেন, এত কেস হয় কেন আজ কাল? সিডিশন থাকা আর সিডিশন-কেস থাকা এক কথা নয়। কেস যে আছে তার কারণ কি জানেন? গ্রেটেষ্ট গুড অব দি গ্রেটেষ্ট নাম্বার, জনহিতকর ব্যাপার আর কি, বুঝলেন না? এই যেমন দেশে স্বদেশভক্ত ছেলের চেয়ে পুলিসের সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে এবং সিডিশন না হ'লে পুলিসের লোকগুলির অন্ন মারা যায়। একে সংখ্যায় বেশী তায় পুলিসের বাবুদের সকলেই প্রায় ছাপোষা মানুষ এবং বৎসরান্তে, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সিডিশন না হ'লেই টোটালে দেশের লোকের কষ্ট বেশী হবে। তাই জাতীয় মঙ্গলের দিক দিয়েই এর একটা দাম আছে বলা যায়। কি বল, প্রমথ?"

প্রমথ—"আজ্ঞে, যা বলেছেন। ওর উপর কি আর কথা চলে?"

নিরাড়ম্বরবাবু বলিয়া চলিলেন, 'আর যদি এই সিডিশন বন্ধ করতে চাও তাহ'লে এক কাজ কর। এই যত পুলিসের বাবুরা আছেন, তাঁদের সকলের চাকরির নিয়ম ক'রে দাও যে, দেশে যত সিডিশন কম হবে তাঁদের তত বেতন বাড়বে এবং সিডিশন হ'লেই জরিমানা হবে। আরও নিয়ম ক'রে দাও যে যাঁর যাঁর এলাকায় যত সিডিশন কম হবে তিনি তাঁর আফিসে তত বেশীসংখ্যক নিজের ভাগ্নে, সম্বন্ধী প্রভৃতিকে চাকরি দিতে পারবেন; এই সব নিয়ম কর, দেখ দুদিনে দেশে শান্তির বান ডেকে যাবে, ছেলেরা বোমা ছেড়ে ঢিল শুদ্ধ আর ছুঁড়বে না।'

সকলে নিরাড়ম্বরবাবুর কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, কারণ সারবান কথার আদর কে না করে? নিরাড়ম্বরবাবুও কিয়ৎকাল নিজের যশের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া সেই সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "সিডিশনের কথা বলতে মনে প'ড়ে গেল, এ সিডিশন ব্যাপারটা শুধু এই কলিযুগের ব্যাপার নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এর প্রভাব সকল দেশে দেখা গিয়েছে। স্বয়ং যে ভগবান রামচন্দ্র, তাঁর রাজত্বেও সিডিশন দেখা দিয়েছিল। সে কথা রামায়ণে লেখে না, কিন্তু ঋষি মহলে এখনও অনেক কথা শুনতে পাওয়া যায়, যা কেতাবে নেই। এই ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম বদরিকাশ্রমের শ্রীশ্রীউড্ডীয়ানন্দ মহাপ্রভুর কাছে। আরও অনেক কথা তিনি আমায় শুনিয়েছিলেন কিন্তু এইটাই শোন আপাতত—

২

অযোধ্যায় তখন আইনত রাম-রাজত্ব; কিন্তু রামচন্দ্র অযোধ্যায় নাই। তিনি কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে। ভরত তাঁহার চন্দনের খড়মজোড়াকে

সিংহাসনে বসাইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছেন। অতঃ সকল পরোয়ানাতে খড়মের ছাপ লাগাইয়া তবে তাহা জাহির করিতেন। সকল পেয়াদা আদালতে আদালতে

ভরত তাঁহার চন্দনের খড়মজোড়াকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন

খড়ম মার্কা তকমা পরিয়া ঘুরিত ফিরিত। রাষ্ট্রশক্তির নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ঐ খড়ম-জোড়াটা। এমন কি টোল পাঠশালার বকাটে ছেলেরা ভরতের রাজনীতির নাম দিয়াছিল খড়মতন্ত্র। ভরতের সময়কার সকল টাইটেল ও খেতাবও খড়ম-সম্পর্কিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যেমন, রাষ্ট্রের বিশেষ কোন উপকার করিলে মানুষ কার্য্যের গুণানুসারে রৌপ্য বা স্বর্ণ নির্ম্মিত খড়মাকৃতি পদক পুরস্কার পাইত। তদব্যতীত খড়ম-নায়ক, খড়ম-তিলক, খড়ম-মহানায়ক, খড়ম-অধিনেতা প্রভৃতি খেতাব পাইবার জন্যও সকল রাজকীয় কর্ম্মচারী যথাসাধ্য চেষ্টা ও রেষারেষি করিতেন। কাহাকেও সম্মান দেখাইতে হইলে খড়ম-সম্বল, খড়ম-সেবক বলিয়া সম্বোধন করা রীতি ছিল।

ভরতের রাজ্যে শাসন ছিল সবিশেষ কড়া রকমের ; কারণ, ভরতের একমাত্র আদর্শ ছিল রাজ্যটাকে রামের অবর্ত্তমানে ঠিক মত খাড়া রাখা। সেই জন্য তাঁহার রাজত্বে কেহ কোন প্রকার রাজ-অসম্মান-সূচক কার্য্য করিলে তাহার তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করা হইত। খড়ম যে পায়ে পরিবার জিনিষ, মস্তকে ধারণ করিবার নহে, এ কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। খড়ম কথাটি উচ্চারণ করিতে হইলে নিয়ম ছিল যে তৎপূর্ব্বে "শ্রীশ্রী" অথবা "জয়" কথাটি যোগ করিতে হইবে। খড়মের চিত্র লাল, সোনালী অথবা রুপালী রঙে ছাড়া অপর রঙে আঁকিলে তাহাও দণ্ডনীয় ছিল।

ভরত যাহা কিছু যথেচ্ছাচার করিতেন, সকল কিছুই খড়মের আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে

করিতেন এবং খড়ম ধর্ম্ম ও ন্যায়ের নিদর্শন, এই অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর যে ক্ষেত্রে ভরতশাসিত অযোধ্যার সকল বিচার ও সকল শাসন চলিত, সে ক্ষেত্রে ভরতও বস্তুত সকল সমালোচনার উপরে ছিলেন। অর্থাৎ ভরত কোন অন্যায় করিলেও তাহা ন্যায়, ভরতের খেয়াল অযোধ্যাবাসীর জনমত, ভরতের নায়েবগণ অযোধ্যার জনসঙ্ঘের প্রতিনিধি এবং ভরতের অর্থশালায় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে অযোধ্যার সাধারণের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি বহুল প্রকার অসম্ভব সত্যের উপর অযোধ্যার রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে অযোধ্যার মন্দিরে মন্দিরে রাষ্ট্রীয় অর্থে পুষ্ট পূজারীগণ খড়ম-রাজত্বের গুণ কীর্ত্তন করিত এবং তাহারা যাহা বলিত তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহাদের তৎক্ষণাৎ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। ভরতের প্রধান পূজারী এই সকল অবিচারের সাফাই গাহিয়া বলিতেন যে, অবিচার, সুবিচার, অন্যায়, ন্যায় প্রভৃতির কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই, এ সকলের একমাত্র স্থিতি মানুষের অন্তরে। কোন মানব যদি উৎপীড়িত হইয়াও খুশী থাকে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে তাহার উপর কোন অন্যায় করা হয় নাই। কেহ যদি প্রভূত সুবিচার লাভ করিয়াও উৎপীড়িত বোধ করে তাহা হইলে ধরিতে হইবে তাহার উপর অবিচার হইয়াছে। সুতরাং কোন রাজ্যে ন্যায় ও বিচার পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার উপায় সেই রাজ্যের সকল অসন্তুষ্ট প্রজাকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া অথবা বন্দী করিয়া রাখা। কারণ এই উপায় অবলম্বন করিলে সে রাজ্যে আর কোন অসন্তুষ্ট প্রজাকেই দেখা যাইবে না—অর্থাৎ রাজ্যে ন্যায় ও সুবিচার ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

ভরতকে অপরাপর পূজারী প্রভুগণও বুঝাইয়াছিলেন যে, যেমন বাগান সুন্দর রাখিতে হইলে আগাছাগুলিকে মধ্যে মধ্যে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয় তেমনি রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও ন্যায়ের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আগাছার সমতুল্য অসন্তোষের অবতার অবাধ্য প্রজাদিগকেও বাছাই করিয়া রাষ্ট্রীয় জীবন-ক্ষেত্রের বাহিরে স্থাপন করিতে হয়। ভরতও বুঝিয়াছিলেন যে এই যুক্তি অকাট্য এবং তিনি সেই কারণে পূজারীদিগকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়া রাজ্যে পূর্ণভাবে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাম-রাজত্ব, খড়মতন্ত্র অথবা ভরতের রাজ্যে এইরূপে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। সমগ্র রাষ্ট্রে শুধু উঠিতে বসিতে সকলে 'জয় খড়মের জয়' ছাড়া অপর কোন কথা বলিত না। অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সে সময়ে অযোধ্যায় আসিলে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইত যে এত সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার সহিত এত বড় একটা রাজ্য কিরূপ অবাধে শাসিত হইতেছে। তাহারা দেখিত, শিরস্ত্রাণের উপর খড়ম বাঁধিয়া দলে দলে শান্ত্রিগণ শান্তিরক্ষা করিয়া পথে পথে বিচরণ করিতেছে। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার শীর্ষে খড়মচিহ্নিত পতাকামালা পতপত করিয়া উড়িতেছে। পথের পার্শ্বে ও রাজধানীর উদ্যানে উদ্যানে প্রসিদ্ধ খড়ম-অধিনায়ক-

দিগের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। পাঠশালার বালকগণ প্রত্যহ উচ্চৈঃস্বরে খড়মের গুণগান করিয়া তবে পাঠে রত হয়। পথে ঘাটে বাগানে গৃহে সর্ব্বত্র শুধু খড়মের গুণগান। রাজ্যে শান্তি ও সন্তোষের অপ্রতিহত প্রভাব।

৩

রামরাজত্ব যখন এইরূপ অসাধারণ গৌরব ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত ভাবে চলিতেছে, এমন সময় এক দিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় একটা দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া রাজ্যের কর্ণধারদিগের মনে সবিশেষ চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। সেদিন রবিবার। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের চিরানুসৃত প্রথামত সেদিন বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সভার কার্য্য হইতেছিল। পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ধূপ, ধুনা, শঙ্খধ্বনি, স্তুতিগান, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির সাহায্যে সভাস্থ সকলে প্রায় আত্মহারা হইয়া খড়মমাহাত্ম্য উপভোগ করিতেছিলেন।

হঠাৎ সভা একেবারে নিস্তেজ হইয়া গেল। সকলে দেখিল, আঠার জন দীর্ঘকায় দাসের স্কন্ধে একটা বিরাট সিংহাসন ধীরে ধীরে সভায় প্রবেশ করিতেছে। অমনি চারিদিক হইতে "জয় খড়মের জয়" ধ্বনিতে সভা মুখরিত হইয়া উঠিল। সিংহাসনটি ক্রমে সভার একপ্রান্তে, যেখানে ভরত কুশাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে আনিয়া রাখা হইল। ভরত সসম্ভ্রমে উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অমনি সভাজনের সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় শ্রীশ্রীখড়মের জয়"। তার পর রাজপুরোহিত মহাশয় উঠিয়া সিংহাসনের নিকটে গিয়া খড়মের উপর বহুমূল্য কিংখাবের আবরণখানি উত্তোলন করিলেন। করিয়াই তিনি একটা বিরাট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "কি হইল কি হইল" শব্দে সভা পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভরত তাড়াতাড়ি সিংহাসনের নিকটে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনিও "হা হতোস্মি" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া কয়েক জন নিকটবর্ত্তী সভাসদ উঠিয়া সিংহাসনের নিকটে ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন স্বর্ণ সিংহাসনের বক্ষে যে স্থলে রামের খড়মজোড়াটি সতত রক্ষিত হয়, সে স্থলে রহিয়াছে মাত্র এক পাটি খড়ম!

অতি তীব্রবেগে এই দুঃসংবাদ সভায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলে কপালে করাঘাত করিতে থাকে আর শুধু "হায় হায়" বলিয়া আর্ত্তনাদ করে। কিয়ৎকাল এইরূপে কাটিবার পর ভরতের জ্ঞান হইল। তিনি উঠিয়াই বলিলেন, "খড়মের অপমান রাজদ্রোহ। খড়মের এক পাটি অপহরণ রাজশক্তিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা। এ ভীষণ রাজদ্রোহের প্রতিকার চাই, উচ্ছেদ চাই, ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করা চাই।"

সভাস্থ সকলে বলিল, "সাধু সাধু, উৎপাটিত করা চাই-ই।"

ভরত প্রথমত আদেশ করিলেন যে, খড়মের সেবায় যত লোক নিযুক্ত আছে সকলকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে। সকলে উপস্থিত হইল এবং ভরতের প্রধান শান্তিসচিব তাহাদিগকে বিশেষ জেরা করিলেন। জেরায় দেখা গেল যে, যদিও কেহ খড়ম অপহৃত হইতে দেখে নাই তবুও শুধু খড়ম অপহৃত হয় নাই, এরূপ প্রমাণ আছে। খড়মের প্রসাদ যে প্রত্যহ ভোগের পর লইয়া যাইত, সেই ভৃত্য বলিল যে, সেই দিন প্রাতে ভোগের বাসনপত্র পরিষ্কার করিতে গিয়া সে দেখিল যে, একটি স্বর্ণময় থালিকা কম রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত ভোগের ফলমূল পায়সান্ন প্রভৃতিও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। পাছে তাহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করা হয়, সেই ভয়ে সে এই সকল কথা পূর্ব্বে বলে নাই। ভরত এ সকল কথা হইতে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সেই জন্য আদেশ দিলেন, "রাজদ্রোহের মূল গভীর এবং একটা যে বিরাট ষড়যন্ত্র এই রাজদ্রোহের মূলে আছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই ষড়যন্ত্র ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা অতঃপর হইবে। আপাতত খড়মের রাজশক্তি যে এখনও অপ্রতিহত আছে তাহার প্রমাণস্বরূপ থালিকা-অপহরণ-আবিষ্কারক ভৃত্যের প্রাণদণ্ড এবং সিংহাসনবাহক অষ্টাদশ শূদ্রের পৃষ্ঠে এক শত কষাঘাত করিতে হইবে।" সভাস্থ সকলে "ধন্য ধন্য" করিতে লাগিল। ইহাকেই বলে রাজশক্তি! যে রাজশক্তি কখন অন্যায়ের প্রতিকারে তীব্রবেগে প্রজার পৃষ্ঠে পতিত হয় না, সে আবার কি প্রকার রাজশক্তি? রাজা অর্থে ইহা অবশ্য বুঝায় যে, রাজা প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া চলিবেন কিন্তু তৎসঙ্গে ধর্ম্মধ্বংসি প্রজার রক্তে রাজ্যকে রঞ্জিত করাও রাজারই কর্ত্তব্য। রাজার কার্য্যে প্রজার জীবনের পূর্ণতা লক্ষিত হইবে। তাহার মধ্যে, সৃজন পালন সংহার এই তিনটিই পূর্ণরূপে থাকা চাই।

সকলে বুঝিল, খড়মের এক পাটি অপহৃত হইলেও রাজার রাজশক্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই খরধার আছে।

৪

অতঃপর অযোধ্যায় অরাজকতার প্রতিকারস্বরূপ যে রাজকতার সূত্রপাত হইল, তাহা অরাজকতার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ও নির্ম্মম। ভরত রাজ্যের সকল শান্তিরক্ষক রাজকর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন যে, রাজ্যে বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং সকল কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য, যে স্থলেই অল্প রাজদ্রোহিতা দেখিতে পাইবেন সেই স্থলে তৎক্ষণাৎ কঠিন হস্তে তাহার নিপাত করা। কারণ, পাপকে বাড়িতে দিতে নাই। সর্পশিশুর ন্যায় পাপকেও বাড়িবার পূর্ব্বেই বিনাশ করা প্রয়োজন। এই

উপদেশের ফলে রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজকর্ম্মচারীগণ সজাগ হইয়া উঠিলেন এবং সর্পের অভাবে সর্পশিশু বধ করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

অযোধ্যার পূর্ব্ব-সীমানায় একটি পুষ্করিণীতে দশ বারো জন বালক উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতেছিল। এক জন ষড়যন্ত্রান্বেষী কর্ম্মচারী তাহাদিগকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পাকড়াও করিয়া আদালতে উপস্থিত করিলেন। সেখানে বিনা কষ্টে প্রমাণ হইয়া গেল যে ঐ বালক-সঙ্ঘ একত্র হইয়া এক যোগে, এক প্রকার পরিচ্ছদে, কোন এক অজানা কার্য্যে লিপ্ত ছিল। ফলে তাহাদিগের উপর দশ ঘা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়া গেল।

অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদের এক পাচিকার সহিত এক ব্যক্তির প্রণয় ছিল। সে রাজ-প্রাসাদের উদ্যানে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরা-ফেরা করিতেছিল বলিয়া ধৃত হইল। তাহার নিকট একখানা লিপি পাওয়া গেল তাহা নিম্নরূপ—

"প্রাণ-প্রতিমাসু,

তোমা অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল। তুমি কি আমার প্রতি বিরূপা? আমার বক্ষে কি আর সেইরূপ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে না। আগামী কল্য অমাবস্যা; আমি উদ্যান-বাটিকার দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত থাকিব। তোমার দর্শন চাই-ই চাই। না আসিলে মৃতদেহ দেখিবে।"

লিপিখানি পাঠ করিয়া রাজসভার এক নৈয়ায়িক কর্ম্মচারী বলিলেন, যে উহা গূঢ়লেখ বা সাঙ্কেতিক ভাবে লিখিত। উহার উদ্দেশ্য রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরবাসী কোনও এক সহ-ষড়যন্ত্রকারীকে অমাবস্যা রাত্রিতে খড়মের অপর পাটিটিও অপহরণ করিয়া লেখকের হস্তে তাহা অর্পণ করান। কারণ 'প্রাণপ্রতিমা' বলিতে খড়ম ব্যতীত আর কি বুঝাইতে পারে? তৎপরে 'তোমা অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল' ইহার অর্থ এক পাটি খড়ম অপর পাটিকে না দেখিয়া অর্থাৎ নিকটে না পাওয়াতে ষড়যন্ত্রকারীগণ বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। 'আমার বক্ষে' ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বে যেরূপ খড়মের পাটিটিকে প্রাসাদের অলিন্দ হইতে নিক্ষেপ করিয়া ষড়যন্ত্রকারীকে দেওয়া হইয়াছিল এই বারও সেইরূপ করিতে হইবে। ষড়যন্ত্রকারী অমাবস্যা নিশিতে উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে অপর পাটি খড়ম না দিলে বাহিরের ষড়যন্ত্রকারীগণ প্রাসাদ-অধিবাসী ষড়যন্ত্রকারীকে অবশ্য হত্যা করিবে।

এই ব্যাখ্যার পরে যে, বেচারা পাচিকা-প্রণয়ীর প্রতি শূলে চড়িবার আদেশ হইল তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে?

এইরূপ বহু শত অভিযোগে অযোধ্যারাজ্যের সকল বিচারালয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কোথাও তিন চার জন যুবক গোপনে নৌকা আরোহণে সরযূবক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছিল; কোথাও কেহ শুধু একাকী গৃহের ছাদে বসিয়া কি যেন কি কুচিন্তা করিতেছিল; এইরূপ অভিযোগের ফলে অযোধ্যার বহু শত যুবক অযথা কারারুদ্ধ হইল। অবশ্য সমগ্র রাষ্ট্রের

উপকারের জন্য সামান্য কয়েকজন লোক কষ্ট ভোগ করিলে ইহার মধ্যে অন্যায় কিছুই ছিল না।

বিচারালয়ে যখন বিচার চলিতে লাগিল, সেই সময় অযোধ্যার গৃহে গৃহে রাজকর্ম্মচারীগণ প্রবেশ করিয়া হৃত খড়ম পাটিটির জন্য খানাতল্লাসি করিতে লাগিল। কেহ যে কিছু লুকাইয়া রাখিবে এমন উপায় রহিল না। লোকের সিন্দুক, তোরঙ্গ, পুঁটুলি, হাঁড়ি, লেপ, তোষক, এমন কি ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া খানাতল্লাস হইতে লাগিল। কিন্তু পাওয়া গেল কিছুই না। রাজ-প্রাসাদে নানা স্থলের খানাতল্লাস-লব্ধ বহু ছোট বড় নূতন পুরাতন খড়ম আসিয়া গাদা হইতে লাগিল। কিন্তু রামচন্দ্রের সেই শ্রীশ্রীখড়মের পাটি যেমন নিরুদ্দেশ তেমনি নিরুদ্দেশই রহিয়া গেল।

৫

রাজ-প্রাসাদের এক বৃহৎ উঠানে সারি সারি গণৎকারগণ খড়ি পাতিয়া বসিয়া হারান খড়মের ঠিকানা অন্বেষণে লাগিয়া গেল। কেহ বলিল যে, তাহা এক দল দস্যুর আস্তানায় বিন্ধ্যাচলের এক গুহা মধ্যে রহিয়াছে। অপর কেহ বলিল, উহা লইয়া এক জন ডাইনী রামচন্দ্রের প্রাণনাশের জন্য তুকতাক করিতেছে। এক এক জন এক এক কথা বলে এবং সেই অনুসারে রাজ্য ওলট-পালট হয়। কখন বিন্ধ্যাচলের গুহায় গুহায় রাজার সেনাগণ ঘুরিয়া মরে, কখন বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের গৃহে গিয়া সান্ত্রীগণ অত্যাচার করে। কিন্তু কোনই ফল হয় না। ভুল পথে চালাইবার জন্য এক জনের পর এক জন গণৎকারকে উল্টা গাধায় চড়াইয়া রাজ্যের বার করিয়া দেওয়া হয়।

ভরত ষড়যন্ত্রের ভয়ে কাতর। রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হয় না। অন্ধকারে তিনি ছুরিকা দেখেন, খাদ্যে বিষ দেখেন এবং সর্ব্বত্র গুপ্ত ঘাতকের ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠেন। তাঁহার জন্য প্রাসাদের সর্ব্বত্র সারা রাত্রি প্রদীপ জ্বলে। ভোজনকালে বিড়ালশাবকগণ রাজ-ভোগের ভাগ পাইয়া পাইয়া স্থূল বর্ত্তুলাকার হইয়া উঠে এবং রাজ-প্রাসাদের [illegible] সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি হয়।

এমন সময় এক দিন রাজার প্রধান পুরোহিত অতি প্রাতে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া [illegible] সরযূ নদীতে অবগাহন করিতে গেলেন। সরযূ নদীর স্নানের ঘাটের উপর একটি [illegible] ছায়ায় এক বৃদ্ধা বসিয়া বসিয়া পুষ্প, মাল্য, তৈল প্রভৃতি বিক্রয় করে এবং [illegible] ফোঁটা কাটিবার জন্য স্নানার্থীদিগকে চন্দন সরবরাহ করে। পুরোহিত মহাশয় [illegible] জলে অবস্থান করিয়া উঠিয়া আসিয়া শিখার জন্য একটি পুষ্প ও তিলকের জন্য কিছু [illegible] আহরণার্থে বৃদ্ধার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একটি

ফুল দিল; কিন্তু চন্দন দিতে গিয়া দেখিল, চন্দনের পাত্র শূন্য। ইহা দেখিয়া সে ঠাকুরকে বলিল, "প্রভু আপনি দয়া করিয়া অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য চন্দন বাটিয়া দিতেছি।" রাজপুরোহিত দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধা চন্দন বাটিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পুরোহিত ঠাকুর বিকটস্বরে, "অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া তীব্রগতিতে বৃদ্ধার সম্মুখ ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল। বৃদ্ধাও কিছু বুঝিতে না পারিয়া "হায় কি হইল" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

পুরোহিত ঠাকুর কিন্তু অনতিবিলম্বে কয়েকজন প্রহরী লইয়া সেই স্থলে ফিরিয়া আসিলেন এবং খুব জোর গলায় বলিলেন, "ঐ বৃদ্ধাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং উহার পুঁটুলি খুলিয়া কি আছে দেখ।"

প্রহরীগণ বৃদ্ধার পুঁটুলি খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে হারান সোনার থালাখানি ও খড়মের পাটিটি বাহির হইয়া পড়িল। সকলে স্তম্ভিত। বৃদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ শিকলে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে রাজার সভায় লইয়া যাওয়া হইল।

বৃদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ শিকলে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে রাজার সভায় লইয়া যাওয়া হইল

ভরত থড়ম ও থালিকা বৃদ্ধার নিকট পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহাকে তাহার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদিগের নাম বলাইবার জন্য নির্য্যাতন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা সহস্র নির্য্যাতন সত্ত্বেও কিছু বলিল না। ভরত তখন গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "রে নারী, তুই কি জানিস না যে তোর এ অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড? তবে তুই কেন বৃথা নিজের পাপ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিস?"

বৃদ্ধা বলিল, "প্রভু, আমি কি করিয়াছি জানিলে বলিতে পারি, সে বিষয় আমি কি জানি।" ভরত উত্তেজিতকণ্ঠে পার্শ্বস্থ সমরসচিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, ইহাকে ইহার অপরাধের কথা বলা হয় নাই?"

সমরসচিব ভীতকণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু, কি অপরাধ তা তো সকলেই জানে; বলিব আর কি?"

বৃদ্ধা কাতর হইয়া বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সকলেই জানে আমি ব্যতীত।"

ভরতের আদেশে তখন বৃদ্ধাকে বলা হইল যে, সে অপর বহুব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রামচন্দ্রের খড়মের এক পাটি অপহরণ করিয়াছে ও রাজ্যে বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেছে, এই অপরাধে সে ধৃত হইয়াছে।

বৃদ্ধা সকল কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু, বিগত মাসের প্রথম ভট্টারক-বারের প্রাতে আমি যখন আমার ব্যবসাস্থলে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার মাথার উপরে বৃক্ষশাখায় আওয়াজ শুনিয়া চাহিয়া দেখি একটা বানর আমার উদ্দেশ্যে বিকট মুখভঙ্গি করিতেছে। তাহার হস্তে কি একটা চকমক করিতেছিল। আমি তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেই সে সশব্দে আমার পদপ্রান্তে তাহার হস্তস্থিত বস্তু নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল, আমি দেখিলাম একখানা উৎকৃষ্ট পিত্তল থালিকা, কিছু অখাদ্য ভোজ্য বস্তু ও এক পাটি চন্দন কাষ্ঠের খড়ম। আমার নিকটে তৎকালে চন্দন কাষ্ঠ অল্প থাকাতে আমি থালিকা ও পাদুকা সযত্নে তুলিয়া রাখিলাম ও ভোজ্যগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলাম। সেই দিন হইতে আমি খড়মের পাটিটি ঘষিয়া সকলকে চন্দন-প্রলেপ সরবরাহ করিতেছি। প্রভু, ভগবান আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে পিত্তল থালিকা ও চন্দনকাষ্ঠখণ্ড দান করিয়াছেন, ইহাতে আমার অপরাধ কোথায়?" সকলে এই কাহিনী শুনিয়া তো অবাক! ভরতের মানস-চক্ষের সম্মুখ দিয়া মাসাধিককালের অকারণ বিভীষিকার দৃশ্যগুলি যেন পুনর্ব্বার অভিনীত হইয়া গেল। তিনি জড়িতকণ্ঠে বৃদ্ধাকে খড়মের ভোগের প্রতি 'অখাদ্য' কথাটি প্রয়োগ করার অপরাধে পাঁচ ঘা বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। এত ভীতি, এত হট্টগোল, সব কিনা একটা বানরের জন্য! ছি, ছি, তিনি কি করিয়া সভাস্থলে মুখ দেখাইবেন! সেই দিন রাত্রেই একটা বিশেষ আদেশ-পত্র সকল সভাসদের নিকট চলিয়া গেল; যেন তাঁহারা কেহ খড়মসংক্রান্ত আসল খবর প্রকাশ-না করেন এবং তৎপরে দেশের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করা হইল যে, ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে, খড়মের পাটিটি বহু কষ্টে ষড়যন্ত্রকারীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, কিন্তু ভরত-রাজের অতিশয় দয়ার শরীর, তিনি তাই ষড়যন্ত্রকারী বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে শুধু একটা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, তাহারা ভবিষ্যতে আর কখন কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিবে না। খড়মের যে দিকটা প্রলেপের উদ্দেশ্যে ঘর্ষিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল,

সেই দিকে সুদক্ষ কারিগর দিয়া একটা চন্দন কাষ্ঠের তালি লাগাইয়া লওয়া হইল এবং রাজ-প্রাসাদের বাতায়নগুলিতে বানরের প্রবেশ নিবারণার্থ গরাদে বাসন হইল।"

৬

নিরাড়ম্বরবাবু গল্প শেষ করিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! রাত প্রায় ন'টা বাজে। আজ আর নয়; চলি।"
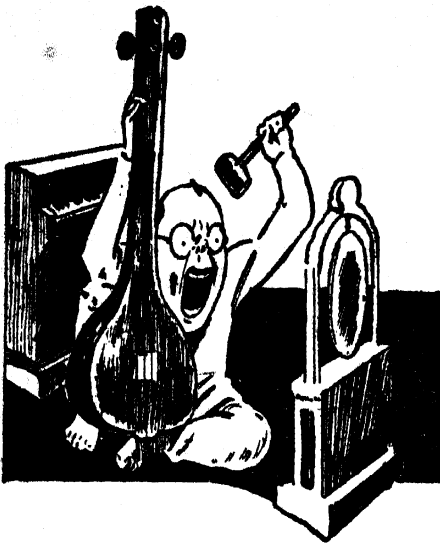
ভূমিকা

এই বৎসর কলিকাতায় যতগুলি বাঙালী শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় কুড়িজনের নাম রাখা হইয়াছে আবেদন। অকস্মাৎ বাঙালী-সমাজে এই নামটির প্রতি এইরূপ পক্ষপাতিত্বের যে সূচনা হইয়াছে তাহা যে অকারণ নহে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। গত দুই তিন বৎসর যাবৎ বঙ্গসমাজের চোখের মণি, হৃদয়ের ধন, প্রাণের প্রাণ রূপে যিনি আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীআবেদন পাকড়াশীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপই বাঙালী আজ তাঁহার নামে নিজ সন্তানের নাম রাখিয়া তাঁহার নাম বাংলাদেশে চিরধ্বনিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বাংলার সকল পাঠশালা ও স্কুল খুঁজিয়া বেড়াইলেও দুই একটির অধিক রামমোহন, রামকৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র কিম্বা কেশবচন্দ্র পাওয়া যাইবে না; কিন্তু দুই চার বৎসরের মধ্যেই বাংলার স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন 'আবেদন'দিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখিয়া পুরস্কার ও শাস্তি বিতরণ করা যে এক নিদারুণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে বীরপূজার অদম্য তাড়নায় আগ্রা অযোধ্যা ও বিহারের অর্দ্ধেক লোক আজ 'হনুমান' এবং উড়িষ্যার অর্দ্ধেকের অধিক 'জগন্নাথ' সেই বীরপূজার আবেগই আজ আবার বাংলার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ও ঘরে ঘরে 'আবেদন' নামোচ্চারণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্ন্যাল ও মিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া

পিতুড়ি, নন্দন ও ভড় সকল প্রকারের 'আবেদনে'ই যে অচিরাৎ বাংলা পূর্ণ হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে পুণ্যস্মৃতি ও মহাদ্যুতিমান অতিমানবের নাম কোন এক ভাগ্যবান জনকজননী সর্ব্বাগ্রে আবেদন রাখিয়াছিল তাঁহাকে মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কাহিনীর ভূমিকায় নিযুক্ত হই।

/০

আবেদনের পিতা নীলাম্বর পাকড়াশীমহাশয় একদা আফিস হইতে গৃহে আসিবার পথে অকারণ পুরাতন পুস্তকের দোকানে ঢুকিয়া সস্তায় ডার্‌উইনের জগদ্‌বিখ্যাত 'জীবজাতির উৎপত্তি' (Origin of Species) নামক পুস্তকখানি ক্রয় করেন। ঘরে পৌঁছিয়াই শুনিলেন, পত্নী একটি পুত্র-সন্তানের জননী হইয়াছেন। নীলাম্বরবাবু ভাবিলেন, তাই তো, কখন তো আমার পুস্তক ক্রয়ের ইচ্ছা হয় না। তবে আজই বা কেন এইরূপ ইচ্ছা হইল? ইহার কি তাহা হইলে কোন গূঢ় অর্থ আছে? ঈশ্বর কি আমায় এই অকারণ পুস্তক ক্রয়েচ্ছার ভিতর দিয়া গোপনে কোন আদেশ জানাইতেছেন।

নীলাম্বরবাবু সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া বুঝিলেন, মানুষের যে উন্নতি, তাহার যে ব্রহ্মের সহিত মিলনের পথে অনন্ত উদ্দাম গতি, তাহার সমস্তটিই ভবিষ্যতের বুকে নিহিত রহিয়াছে। অতীতে যে মানব বানর ছিল, ভবিষ্যতে সে হইবে দেবতা। যুগে যুগে, পলে পলে নিত্য নূতন ব্যক্তির জন্ম ও জীবনের ভিতর দিয়া কোন এক অজানা সৃজন-শক্তি নিরবচ্ছিন্ন আবেগে আপন আত্ম-প্রকাশে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণতি কি, কোন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই বিশ্বশক্তি অগ্রসর হইতেছে তাহা অচিন্তনীয়। আমরা জানি, শুধু আমরা এই ক্রমবিকাশ লীলা-উন্মত্ত সর্ব্বনিয়ন্তার ক্রীড়নক মাত্র। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে সম্মুখে চলিয়াছি, অতীত আমাদের পায়ের নীচে—অতীতের ধাপ বাহিয়া আমরা ক্রমশ ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছি। সন্তান যে, সে পিতার তুলনায় ব্রহ্মের নিকটতর।

সৃষ্টিশক্তি সন্তানের ভিতর দিয়া তাহার যে আবেদন (আকাঙ্ক্ষা), তাহা প্রকাশ করিতেছে। নীলাম্বরবাবু শিহরিয়া উঠিয়া বুঝিলেন, যশোদা কেন কৃষ্ণের মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। আজ এই যে সন্তান তাঁহার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহার মধ্য দিয়া ভগবান আপনার আদর্শের আরও কতখানি প্রকাশ করিবেন তা কে বলিতে পারে? নীলাম্বরবাবু একবার এই সন্তানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

পাশের ঘরে সদ্যোজাত সন্তানের ক্রন্দনে নীলাম্বরবাবুর চমক ভাঙিল। তিনি উঠিয়া পাশের ঘরে গমন করিলেন। কিছুকাল সন্তানের দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া নীলাম্বরবাবু যখন তাহাকে ক্রোড়ে না লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তখন

বৃদ্ধা ধাই কাত্যায়নী ওরফে কাতু "ওমা কি হ'ল গো" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বাহিরের দালানে দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল এবং গোলমাল করিয়া বাড়ির অপরাপর লোকদিগকে আঁতুড়ঘরের দরজায় আনিয়া জড় করিল। নীলাম্বরবাবু স্মিতহাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, ব্যাপার কিছুই নহে, তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক পূর্ব্ববৎই আছে; শুধু তিনি ভগবানের আদেশেই অনন্তের আদর্শকণিকা এই শিশুকে ভক্তি নিবেদন করিতেছেন। সবাই অবাক! নীলাম্বরবাবু সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই শিশু মধ্যে যে সৃষ্টির আবেদন নিহিত রহিয়াছে, তাহার তুলনায় শঙ্করের দর্শন, গৌতম বুদ্ধের দিব্যবাণী, চৈতন্যের প্রেমের আহ্বান অতি নিম্নস্তরের ব্যাপার। নূতন যে আসিয়াছে সে তো অতীতের সকল সঞ্চিত উন্নতির আধার বটেই—তা ছাড়া তাহার ভিতর রহিয়াছে অনন্তের আলোক, ঝরণার পুণ্য নীরের আর এক অঞ্জলি। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানব ভগবানের চরণে তমসো মা জ্যোতির্গময় বলিয়া যে প্রার্থনা জানাইয়াছে বর্ষে বর্ষে নিত্য-নূতন শিশুর-জন্মের ভিতর দিয়া ভগবান মানুষকে সেই প্রার্থিত পূর্ণজ্যোতি এক এক রশ্মি করিয়া দান করিতেছেন। নীলাম্বরবাবুর মুখ হৃদয়ের আবেগে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সকলে তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। তিনি সম্ভবত আরও অনেকক্ষণ সমান তোড়ে কথা বলিয়া যাইতেন; কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা পিসিমাতা এইসব শুনিয়া হঠাৎ হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তার পর তীরবেগে ছুটিয়া পাশের ঘর হইতে একটা শাঁখ আনিয়া জোরে জোরে বাজাইতে লাগিলেন ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে উলু দিবার জন্য দম লইবার ফাঁকে ফাঁকে আদেশ করিতে লাগিলেন।

(সশব্দে)

"ওরে, ঘরে দেবতা এসেছেন, উলু দে, উলু দে!"

"ও খেঁদীর মা, শাঁখটা বাজা না মা, বুকে যে আর জোর নেই।"

(রাগত)

"ওরে পোড়াকপালে দরোয়ান মিন্‌সে গেল কোথায়? জোড়াপাড়া থেকে একটা শানাই আনতে যাক না।"

(আবেগভরে)

"ও নীলু, তুই কি পুণ্যি করেছিলি রে!"

(ফুঁপাইয়া)

"দাদা দাদা, তুমি দেখে যেতে পারলে না!"

(হাঁপাইয়া)

"উঃ ওরে, ওমা খেঁদী, একটা মোড়া এনে দে না, আর তো পারি না।"

পিসিমা একাই নানান আবেগের ঐক্যতানে আঁতুড়মঞ্চ এমন সরগরম করিয়া তুলিলেন যে, স্বয়ং নীলাম্বরবাবুও মিনিট পনের ডারুউইন ও ক্রমবিকাশ ভুলিয়া 'থ' অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রহিলেন। তার পর দুই দিন ধরিয়া বাড়িতে পাড়ার লোকের ভিড়ে ইঁদুর বিড়ালেরও স্থান রহিল না। নীলাম্বরবাবুর পিসিমা সর্ব্বত্র রটাইয়া দিলেন যে, 'আমাদের নীলু'কে স্বয়ং মা দশভুজা স্বপ্ন দিয়াছেন যে, তাহার বাড়িতে এক অবতারের আবির্ভাব হইবে। ফলে গিনি হাফগিনি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুলি ও কিং এড্‌ওয়ার্ডের দুয়ানি অবধি সকল প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় নবজাত শিশুর তক্তপোষের পাদদেশ ভরিয়া উঠিল।

৶৹

নীলাম্বরবাবু আফিসের ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ধরণীনাথের সহিত পুত্রের নামকরণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া তাহার নাম রাখিলেন আবেদন। ধরণীনাথ বলিল, সে অনেক নামে অদ্যাবধি চিঠিপত্র প্যাকেট ইত্যাদি পাঠাইয়াছে, কিন্তু আবেদন নামটি কখন তাহার চোখে পড়ে নাই। সৃষ্ট জগতের আবেদন শিশুর জীবনের ভিতর দিয়া প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে বলিয়াই নীলাম্বরবাবু এই নামটি নির্দ্ধারিত করিলেন।

আবেদন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। চারিপাশে তার পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া দূর সম্পর্কের কাকা মামা ও মাসিরা তাহাকে একাধারে পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া তাহার মনোভাব চাকরিতে সদ্যনিযুক্ত ইংরেজ ছোকরা সিভিলিয়ানের সমতুল্য করিয়া তুলিল। ভবিষ্যতে সে কমিশনার বা গভর্নর হইবে, এই কথা স্মৃতিতে চিরজাগ্রত রাখিয়া যেমন বৃদ্ধ ডেপুটি ও সাব-ডেপুটিগণ ছোকরা সিভিলিয়ানের সকল দোষত্রুটি ও ধৃষ্টতাকে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে গুণ ও অমায়িকতা বলিয়া ভ্রম করে, আবেদনের সকল অন্যায় আবদার ও অশোভন ব্যবহার তেমনি তাঁহার গুরুজনদিগের স্নেহ ও ভক্তিকাতর চক্ষে সরলতা নামে অভিহিত হইয়া আবেদনকে বাচালতা ও অশিষ্টতার ক্রমবিকাশ-মার্গে দ্রুত অগ্রগামী করিয়া তুলিল।

নীলাম্বরবাবু কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন যে, প্রাচ্যের কোন এক মহাশক্তিশালী জাতির লোকেরা পূর্ব্বপুরুষের পূজা করে। তিনি ডারুউইনের কেতাবখানি পাঠ করিবার পরে স্থির করিয়াছিলেন যে, নির্বুদ্ধিতার ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট উদাহরণ আর পাওয়া সম্ভব নহে। যে পূর্ব্বপুরুষগণের অন্বেষণে অধিক দূর যাইলে বৃক্ষে আরোহণ করিতে হয় সেই পূর্ব্বপুরুষের পূজা! হায় মূঢ় নর! এত কাল কি নিদারুণ অজ্ঞানতার মধ্যেই ডুবিয়া ছিলে! নীলাম্বরবাবু বলিলেন, "মানুষকেই যদি পূজা করিবে তবে যাহার মধ্যে ভগবানের ছায়া গাঢ়তম হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে পূজা কর।" তিনি আবেদনের জন্মের তিন চার

সন্তান-পূজা

মাস পর হইতেই গৃহে নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া "সন্তান-পূজা" করিতে লাগিলেন। শিশু অবস্থায় আবেদন পিড়িতে শায়িত অবস্থায় পূজা গ্রহণ করিত, পরে তাহাকে একখানা আবলুস কাষ্ঠের চৌকিতে বসাইয়া পূজা করা হইত। সে ফুল

আলো শাঁখ ও ঘণ্টা যতটা পছন্দ করিত, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পছন্দ করিত নিজের ভোগটি। আবেদনের প্রসাদ অনেক সময় পিঁপিড়ার পক্ষেও যথেষ্ট হইত না।

এইরূপে আবদার ও পূজা পাইয়া সন্তান-দেবতা আবেদন ক্রমশ বড় হইতে লাগিল। দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সে শিশু অবস্থা হইতেই নির্ব্বিকারচিত্তে ছোটবড়নির্ব্বিশেষে সকলকে সর্ব্বপ্রকার উপদেশ দিতে পারিত। খৃষ্টীয়ানদিগের ভগবান যখন অনন্ত অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া হয়রান হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আলো হউক" তখন যেমন তাঁহার চিত্তে এরূপ কোন সন্দেহ জাগে নাই যে, তাঁহার অভ্রান্তবাণীতে আলো না হইয়া একটি উর্দ্ধ-লাঙ্গুল গো-বৎসও হইতে পারে, আবেদনও তেমনি যখনই কিছু উচ্চারণ করিত তখন কদাপি তাহার নিজের মত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটিতে পারে এরূপ কল্পনাও করিতে পারিত না। সেই যে সে সকল মতামত ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার একমাত্র নিয়ন্তা এই ধারণা আবেদনের অন্তরে দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল। আবেদন বাড়িতে লাগিল।

৶০

আবেদনের যখন আট বৎসর পাঁচ মাস বয়স সেই সময় এক দিন সন্তান-পূজা-নিযুক্ত অবস্থায় নীলাম্বরবাবু জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন ভুগিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুসরণ করিলেন। এই ঘটনার ফলে সকল বিষয়েই একটা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল। আবেদনের এক কাকা বিলাত-প্রত্যাগত ও কুসংস্কার-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এত দিন নীলাম্বরবাবুর কার্য্যকলাপ দেখিয়া শুধু দূর হইতে নাক সিঁটকাইতেন। আজ নীলাম্বর-বাবুর মৃত্যুতে তিনি যেন একটা উঁচুদরের সুবিধা পাইয়া গেলেন। তিনি নীলাম্বর-বাবুদের বাড়িতে আসিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান সুরু করিলেন। আবেদন প্রথম দিনই তাঁহাকে বলিল, "তুমি যে ভারি আমায় প্রণাম করলে না?"

কাকা বিরাক্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার পূজা ভাল ক'রে করব ব'লে একটা চাবুক আনতে পাঠিয়েছি।"

আবেদন বলিল, "চাবুক কা'কে বলে?"

কাকা তাহাকে বলিলেন যে, সে এক প্রকার জিনিষ যাহার স্বাদ একবার পাইলে আর কখন ভুলা যায় না। এত দিন আবেদনের অক্ষর পরিচয়ও হয় নাই। কাকা তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য লইয়া যাইবেন বলায় আবেদন বলিল, "লেখাপড়া তো যারা চাকরি করে তারা করে, আমি কেন লেখাপড়া করতে যাব?"

কাকা তাহাকে কানে ধরিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

অতঃপর কিছুকাল আবেদন স্কুলের সহপাঠীদিগের নিকট প্রহার ও মাষ্টারদের কাছে তাড়া খাইয়া সন্তান-দেবতা ভাব কথঞ্চিৎ ভুলিবার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু শিশুকালে যে ভাব মনের উপর গভীর হইয়া একবার বসিয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত কোন কালেও হয় না। আবেদন আগের ন্যায় আর আজকাল সকল কথায় কথা বলিত না বটে, কিন্তু যখন কথা বলিত, তখন তাহার প্রতি অক্ষরে বড়লাট ও তারকেশ্বরের মোহন্তমিশ্রিত একটা ভাব পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিত। এইরূপে আবেদন স্কুলজীবন অতিবাহন করিয়া সংসারযাত্রার সেই চৌরাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে দাঁড়াইয়া মানুষ স্থির করে সে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, হাতুড়ে, লেখক, নিকর্ম্মা, এঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, ধর্ম্মপ্রচারক, শেয়ারের দালাল, প্রফেসর, আই. সি. এস., মোটর ড্রাইভার, অর্ডারসাপ্লায়ার, স্বরাজিষ্ট্ ইত্যাদি নানা প্রকার জীবের মধ্যে কোন যূথের অনুসরণ করিবে।

কাকা বলিলেন, "আবেদনের যে রকম উৎকৃষ্ট ধরণের মগজ, তাহাতে তাহার লেখা-পড়ার দিকে না যাইয়া কোন হাতের কাজে মনোনিবেশ করা উচিত।" পিসিমা বলিলেন, "ও এল.-এ. পাশ দিয়ে ওকালতি করুক। ও পরে ঠিক ডেপুটি হবেই হবে।" জ্যাঠা বলিলেন, "দিদি, তুমি যা বোঝ না সে বিষয়ে কথা বল কেন? ওরকম ক'রে ডেপুটি মহাভারতে নকুল-সহদেব হয়েছিল শুনেছি, আজকাল ওরকম হয় না। দেখ আবেদনকে তার চেয়ে ডাক্তারি পড়াও।" কাকার আপত্তি সত্ত্বেও আবেদন ডাক্তারি পড়িবে ঠিক করিয়া আই. এস-সি. পড়িতে আরম্ভ করিল। তবে দুই বৎসর পরে যখন তার নাম পাস-লিষ্টে রেজিষ্ট্রারের সহির অতি নিকটেই দেখা গেল তখন সকলে তাহার ডাক্তার হওয়ার আশা ত্যাগ করিয়া তাহাকে ভেটেরিনারি কলেজে গরু ঘোড়ার চিকিৎসক হইতে পাঠাইলেন। কাকা বলিলেন, "যাহার যে-জাতীয় জীবের সহিত সাদৃশ্য ও সহানুভূতি অধিক তাহার পক্ষে সে জাতীয় জীবের সহিত কারবার করাই শ্রেয়।"

।•

আবেদনের মাতামহ বড় পাখোয়াজী ও গাইয়ে ছিলেন। আবেদনের জীবনে বংশানুক্রমিতার জন্য সঙ্গীত ও নিজ প্রতিষ্ঠালব্ধ গুণে হোমিওপ্যাথি, এই দুইটি জিনিষের বিশেষ প্রভাব তাহার বাল্যকাল হইতেই দৃষ্ট হয়। জনন-বিজ্ঞানে বলে যে বংশানুক্রমিক গুণাগুণ এক পুরুষ ছাড়িয়া তৃতীয় পুরুষেই অধিক প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে এই ধারণার নির্ভুলতা প্রমাণ হইয়াছিল। অতি বাল্যকাল হইতেই আবেদন সকল আবদার ও ক্রন্দন সুর করিয়া করিত। যথা সে ভাত খাইবার সময় হইলে চীৎকার করিত—

॥	১ ॥A	॥	+ ॥A	॥	৩ ॥	÷	
র	গ	র	গ	র	গ	র	
আ	মি	ভা	ত	খা	বব	....	......

তাহার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সে "ওরে নীল আকাশের পাখী, আমার খাঁচায় আসবি না কি" বলিয়া একটা গান বাঁধিয়া সকাল হইতে রাত্রি অবধি গাহিত। এই গানের সুরটাকে রামকেলি-মিশ্রিত বেহাগ বলিলে ভুল হইবে না। তাহার এত অল্প বয়সে এরূপ সুরসিদ্ধতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিল। অতি অল্প বয়সে একবার ভুল করিয়া হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল এক মুঠা খাইবার পর হইতেই হোমিওপ্যাথির প্রতি আবেদনের একটা বিশেষ ভালবাসার সূচনা হয়। এই ভাব ক্রমে বাড়িয়া তাহাকে বাল্যে গোঁড়া হোমিওপ্যাথি-ভক্ত করিয়া তুলে। এমন কি, সে হাত পা কোথাও কাটিয়া-কুটিয়া গেলে কদাপি আর্নিকা ছাড়িয়া টিংচার আইয়োডিন ক্ষত স্থানে লাগাইতে দিত না। স্কুলে পাঠের সময়েও সে পাঠ্য ও অপাঠ্য জাতীয় সকল পুস্তক ফেলিয়া চিলে-কোঠায় বসিয়া 'সরল হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা'য় মনোনিবেশ করিত। আবেদন যে সময়ে ভেটেরিনারি কলেজে ভর্ত্তি হইল সে সময়ে তাহার হোমিওপ্যাথি-প্রীতি বিশেষ গভীরতা লাভ করিয়াছিল।

।/০

কিছুকাল ভেটেরিনারি কলেজে পাঠের পরে আবেদনের অন্তরে একটা দারুণ সমস্যা ক্রমশ প্রকট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। তাহার আজন্ম-সঞ্চিত জ্ঞানে আবেদন বুঝিয়াছিল যে, অ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা ও ঈশ্বরের সযত্নে সৃষ্ট প্রাণীগণকে বিষ পান করান একই কথা। তাহা ব্যতীত সার্জ্জারির উগ্রস্বভাব তাহার কোমল প্রাণে বড়ই অসহ্য ঠেকিত। কিন্তু ঘোড়ার হাসপাতালে সবই অ্যালোপ্যাথি ও সার্জ্জারি; কথায় কথায় বিষবৎ ঔষধ প্রয়োগ ও ছুরি কাঁচি সঞ্চালন। বেচারা অবলা জীব-জন্তুদিগের প্রতি এ অবিচার ও অত্যাচার দেখিয়া আবেদনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

এক দিন সে দেখিল, একটা অশ্বতরের খুর কাটিয়া চাঁছিয়া কি যেন করা হইতেছে। সেখানে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ উপস্থিত ছিলেন না। আবেদন বলিল, "আরে, কেন শুধু শুধু জানোয়ারটাকে কষ্ট দিচ্ছ? একটু থুজা থার্টি লাগিয়ে দাও, আর এক ডোজ ঘাসের সঙ্গে মেখে খাইয়ে দাও, ব্যাস, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তাহার মুখের আত্মবিশ্বাসপর ভাব দেখিয়া অল্প-বেতনভোগী নিরক্ষর যে লোকটি অশ্বতরের চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিল সে অবাক হইয়া বলিল, "সে কি-রকম ওস্দ মসাই? তাও আবার হয় নাকি? কই, দিন তো দেখি, কেমন খুব ঠিক হয়ে যায়!"

আবেদন তাড়াতাড়ি বাইসিক্ল চড়িয়া নিকটবর্ত্তী এক হোমিওপ্যাথিক দোকান হইতে ঔষধটি আনিয়া দিল। খাওয়ান হইল। খুরে লাগাইবার সময় লোকটি আবেদনকে বলিল, "নিন মসাই, আপনার ওস্দ আপনিই লাগান। শেষে বলবেন, লাগাবার ভুলের

জন্যে ব্যায়রাম সারল না।" আবেদন অগত্যা অশ্বতরের নিকটে গিয়া তাহার খুরে থুজা থার্টি ঘষিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু হঠাৎ কি হইল বলা যায় না, কার দোষে হইল তাহাও বলা যায় না, দেখা গেল পায়ের বাঁধন চামড়ার ষ্ট্রাপটি পা হইতে খুলিয়া ফেলিয়া অশ্বতরটি সবেগে আবেদনের প্রতি পদ-সঞ্চালন করিল। আবেদন তীব্রবেগে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য থুজার শিশি মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া তির্য্যক্‌গতিতে পলায়নপর হইল বটে, কিন্তু

জিনের কোটের উপর অশ্বতরের খুরের একটি ছাপ—

তাহার পৃষ্ঠে জিনের কোটের উপর অশ্বতরের খুরের একটা ছাপ, একটা মাঝারি গোছের পতন ও তজ্জাত কয়েকদিনস্থায়ী গাত্র-বেদনা হইতে সে নিজেকে বাঁচাইতে পারিল না।

এই ঘটনার পর হইতে কলেজে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। সে সকলের

নিকট হাস্যাস্পদ হইল, কলেজের প্রিন্সিপাল তাহাকে ডাকাইয়া এ বিষয়ের জন্য তিরস্কারও করিলেন, কিন্তু আবেদনের নিজের হোমিওপ্যাথির প্রতি বিশ্বাস ইহাতে টলিল না।

তার পর কিছুকাল আবেদন বিবেকের দংশন সহ্য করিয়াও চুপচাপ রহিল; কিন্তু যে দিন আসন্ন-বাছুর একটি রুগ্ন গাভী করুণনেত্রে তাহার দিকে তাকাইল, সে দিন সে নিজের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সকল কথা ভুলিয়া গাভীটিকে খড়ের সহিত এক ডোজ পাল্‌সেটিলা সিক্স্-এক্স্ দিয়া ফেলিল। ঘটনাচক্রে এক জন পদস্থ কর্ম্মচারী সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আবেদনকে এদিক ওদিক তাকাইতে দেখিয়া তাহাকে জেরা করিয়া ঔষধ দেওয়ার কথা বাহির করিয়া ফেলিলেন। আবেদনের নামে রিপোর্ট হইল—আবেদন গরু-ঘোড়ার হাসপাতাল হইতে বিতাড়িত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

৷৵০

দিন কতক আবেদন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বাড়িতে বসিয়া রহিল। হোমিওপ্যাথির জন্য জগতের নিকট এইরূপ অবিচার পাইয়া ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার মনটি বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে হোমিওপ্যাথির ফ্যামিলি বক্স্ ও পুস্তকাদি একটা ভাঙা টেবিলের দেরাজে বন্ধ রাখিয়া তাহার জীবনের অপর অবলম্বন সঙ্গীতের উন্মাদিনী সুরতরঙ্গে সকল-কিছু ভুলিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সে সঙ্গীতকে অন্তরের বেদনা ব্যক্ত করিবার শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া বুঝিয়াছিল। তাই তার হোমিওপ্যাথির জন্য আত্মবলিদানের ব্যথা আজ সে ভৈরবী ও যোগিয়ার সকরুণ মূর্চ্ছনায় ভোরের পাখীর সঙ্গে সঙ্গেই একতানে ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিল। সেই একই বেদনার উচ্ছ্বাস আবার শুনা যাইত গভীর নিশীথে চন্দ্রিকা-চকিত তিন-তলার ছাদে নিদ্রাহীন আবেদনের আবেগক্লিষ্ট কণ্ঠের বেহাগ-নিনাদে। সেই কম্পমান কড়ি-মধ্যমের ঢেউ জ্যোৎস্নাসিক্ত পবন-হিল্লোলে বাহিত হইয়া যখন অর্দ্ধসুপ্ত প্রতিবেশীদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তখন তাহারা যাহা বলিত তাহা এ কাহিনীর অন্তর্গত নহে।

ছয় মাস বাইশ টাকা মূল্যের একটি হারমোনিয়ম ও মাতামহের আমলের একটি তানপুরাকে প্রতিবেশীদিগের সহিত সমবেদনায় কাঁদাইয়া আবেদন অবশেষে তাহার কাকাকেও সজাগ করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন, "ছোঁড়াকে চাবকিয়ে আমি সিধে করব।" কিন্তু কার্য্যের বেলা দেখা গেল, আবেদনের মাতা, পিসিমাতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি আবেদনকে আমেরিকায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। আমেরিকা হোমিওপ্যাথির তীর্থস্থান। ছেলেটির যখন হোমিওপ্যাথির দিকেই এতটা টান রহিয়াছে, তখন না হয় ও হোমিওপ্যাথিই শিক্ষা করুক। আবেদন অতঃপর এক দিন দুইটি চাঁদনীর হাল ফ্যাশনের সুট এবং একটি গোলাপী রঙের পাগড়ি লইয়া আমেরিকার পথের পথিক হইল, সঙ্গে লইল সে তার তানপুরাটি।

৸৹

নিউইয়র্কের এক হোমিওপ্যাথিক কলেজের পুরাতন খাতাপত্র ঘাঁটিলে এখনও আবেদনের নাম পাওয়া যাইবে। সেখানে সে বেশী দিন ছিল না, কিন্তু এখনও কলেজের কেহ কেহ তাহার নাম করিলে সহাস্যমুখে তাহার কথা স্মরণ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। যে দিন সে প্রথম গোলাপী পাগড়িটি পরিধান করিয়া কলেজে যায়, সেই দিন হইতে কলেজের সকলে তাহাকে দেখিলেই অকারণে মুচকি হাসি হাসিত। ইহাতে আবেদন মনে বড় ব্যথা পাইল। সে হোমিওপ্যাথির জন্য সব সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অপরে যে তাহাকে লইয়া অযথা তামাসা করিবে, ইহা তাহার পক্ষে সহ্য করা একটু দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। কলেজের একটা ক্লাবের সেক্রেটারি তাহাকে এক দিন বলিল, "মিষ্টার পাকড়াশী, তুমি এক দিন আমাদের ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে কিছু বল না?"

আবেদন বলিল, "আমি আর কি বলতে পারি বল না? কোন বিশেষ বিষয় বললে চেষ্টা করতে পারি।"

ইয়াঙ্কি ছোকরাটি বলিল, "এই ভারতীয় সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেই কিছু বল।"

আবেদন বলিল যে, সে চেষ্টা করিবে। সে দিন বাসায় ফিরিয়া আবেদন অনেক চিন্তা করিল, এ বিষয়ে কি বলা যায়। অনেক ভাবিয়া সে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। পর দিন কলেজে গিয়া সে ক্লাবের সেক্রেটারিকে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে বিষয়ের নাম করেছ, সেই বিষয়েই আমি কিছু বলব।" যে দিন বিকালবেলা আবেদনের বলিবার কথা সে দিন সে কলেজে যাইবার পূর্ব্বে দেশ হইতে আনীত একখানা সঙ্গীত সংক্রান্ত পুস্তক হইতে অনেক-কিছু একটা কাগজে টুকিয়া লইল। কলেজেও সে কাগজখানা বাহির করিয়া মধ্যে মধ্যে পড়িয়া লইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা সকলে একজোট হইলে পর আবেদনকে তার বক্তৃতা দিবার জন্য একটা বড় টেবিলের উপর সকলে উঠাইয়া দিল। আবেদন যাহা বলিল, বাংলা ভাষায় তাহার সার মর্ম্ম এই—

"সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতের আরম্ভ। প্রথমে ছিল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড প্রবাহের শব্দহীন তরঙ্গ-সংঘাতের অশব্দ সঙ্গীত। তার পর সৃষ্টির যন্ত্র-ঝঙ্কার [illegible] আলাপ। তার পর এসেছিল নানান প্রাণীর জয়-পরাজয়; আনন্দ-বেদনার [illegible]; সর্ব্বশেষে এসেছিল মানুষ, আর এসেছিল তার কণ্ঠনিঃসৃত মনোভাবের অভিব্যক্তি। এই যে নাদ বা সুর ভাবব্যঞ্জক শব্দ ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করে। আমাদের শাস্ত্র বলে—

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবম্।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ॥

পাইতেছে। সৃষ্টির অসংখ্য [illegible]

স্বর। উহা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি [illegible]

স্বরের ভিতর দিয়াই সৃষ্টিশক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাদের এক *একটি করিয়া লইলে* ইহারা এক একটি ভাব প্রকাশ করে। এক একটিকে প্রাধান্য দিয়া অপরগুলি দিয়া তাহাকে হাল্কা বা ডাইলিউট (**dilute**) করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণী রচিত হয়। হোমিওপ্যাথিতে যেরূপ মাদার টিংচার যত অধিক ডাইলিউট করা যায়, ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়, সঙ্গীতে সেইরূপ যে রাগ-রাগিণীতে মূল বা প্রধান বা বাদী স্বরের সহিত অন্য স্বরের মিশ্রণ যত অধিক দেখা যায়, তাহা তত ভাব-উদ্দীপনায় শক্তিশালী। এইরূপে অধিক স্বরবর্জ্জিত রাগ-রাগিণী অল্প স্বরবর্জ্জিত বা সম্পূর্ণ রাগ-রাগিণী অপেক্ষা অল্পশক্তিশালী; কিন্তু হোমিওপ্যাথির লোয়ার ডাইলিউশনের ন্যায় তাহাদের ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা দ্রুত কার্য্যকরী। যথা যোগিয়া ও বঙ্গালী নামক রাগিণীদ্বয়ের মূল স্বর একই। কিন্তু বঙ্গালীতে মা ও নি ব্যবহার না হওয়াতে উহার মিশ্রণ বা ডাইলিউশন অল্প। সুতরাং মনের ভাব প্রকাশে যোগিয়া ও বঙ্গালী একইরূপে উপযোগী। যোগিয়াতে উহা সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু গভীর; বঙ্গালীতে উহা শীঘ্র হয়, কিন্তু যোগিয়ার ন্যায় গভীররূপে হয় না।"

ইয়াঙ্কিরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "Give us a Yogi! Give us a Yogi!" (একটা যোগী গাও! একটা যোগী গাও!)

আর এক দল ভীষণ টেবিল চাপড়াইয়া গাহিয়া উঠিল, "Bong, Bong, Bong," (বং বং বং), give us a song! (একটা গান গাও)।

আবেদন আকুলকণ্ঠে বলিল, "আরও বলবার আছে, থাম। রাগ-রাগিণীর ডাইলিউশন সম্বন্ধে আরও আছে, একটু গোলমাল থামাও!"

কিন্তু কেইবা কার কথা শুনিবে? সকলে আবেদনকে কাঁধে করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ও গাহিতে লাগিল, "Bong, Bong, Bong."

ইয়াঙ্কিরা হুজুগ করিতে আসিয়াছিল; হুজুগ করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু আবেদন মর্ম্মাহত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আর তিন দিন কলেজে গেল না। তার পর এক দিন সে নিউ ইয়র্কের হাওয়া অসহ্য দেখিয়া কালিফোর্নিয়ার টিকিট কিনিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিউইয়র্কে হোমিওপ্যাথির ছাত্রদের লঘুচিত্তের পরিচয় পাইয়া আবেদন আমেরিকা-সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালিফোর্নিয়ায় যখন সে পৌঁছাইবার দুই ঘণ্টার মধ্যে একটা সিনেমা কোম্পানীতে ভারতীয় হাবভাব শিখাইবার কাজ পাইয়া গেল, তখন তার মনের হারান শান্তি কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে, সিনেমার কারখানায় যে সকল লোক ভারতীয় কোন ভূমিকায় অভিনয় করিত, তাহাদের পোষাক ও হাবভাব ঠিক হইত কি না দেখিত।

সিনেমার 'ষ্টার', শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর নাম ছিল, মাদমোয়াজেল ফিফি। তার চেহারাটা দোহারা ও বয়স একুশ হইতে বাহান্নর মধ্যে কিছু-একটা। তিনি আবেদনকে দেখিয়া ও

"কাঁধে করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ও গাহিতে লাগিল, "Bong, Bong, Bong"

তাহার নিকট ভারতীয় দর্শন, বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা, অসহযোগ আন্দোলন, অহিংসা, ভারতীয় নাট্যকলার আদর্শ ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক বহুমূল্য কথা শুনিয়া তাহাকে বড়ই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রণয়ের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, ইহা ঠিক তাহা নহে। আবেদনের মতে ইহার ভিতর ছিল প্লেটোর নিস্পৃহতার আদর্শ, আর ছিল দুইটি জিজ্ঞাসু আত্মার পরস্পর-পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা।—আবেদন ফিফিকে ভারতীয় রাজকন্যা সাজাইয়া একটি সতীদাহ ও জলন্ত প্রেমের দুঃসাহস-সংক্রান্ত নাটিকা "রিলিজ" (প্রকাশ) করায়, তাহাতে নায়িকা মোটরকার ও এরোপ্লেন যোগে কলিকাতায় কেওড়াতলার ঘাট হইতে রাজা রামমোহন রায়ের পরিচিত বন্ধু এক কাশ্মীরী রাজপুত্রের সহিত সমস্ত পথ অশ্বারোহী সৈনিকদিগের দ্বারা অনুসৃত হইয়া শ্রীনগরে পলায়ন করিলেও উক্ত সিনেমা-চিত্র চিকাগো বুষ্টার নামক সংবাদপত্রে প্রশংসিত হইয়াছিল। সেই কাগজে ঐ উপলক্ষে আবেদনের একটি ছবি বাহির হয়; তাহাতে তাহাকে ভারতীয় নাট্যকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, গায়ক ইত্যাদি নানা আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

এইরূপ আরও কয়েকটা ছবি প্রস্তুত করাইতে পারিলেই আমেরিকায় আবেদন

প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিত। তাহাকে অনেকে তখনই স্বামীজি বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এমন সময় আর একটি দুর্ঘটনার ফলে আবেদনকে কালিফোর্নিয়া ত্যাগ করিতে হইল। আবেদন এই সময় আর একটি চিত্রনাটিকা লইয়া ব্যস্ত ছিল। এক জন ইয়াঙ্কি কলিকাতার ঠন্ঠনিয়া কালীবাড়ির কালীর গহনাপত্রের মধ্য হইতে একটি নারিকেলের সমান বৃহৎ হীরক অপহরণ করে। তাহার ফলে দুই জন দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসী তাহাকে জাহাজের খালাসী সাজিয়া নিউইয়র্ক অবধি অনুসরণ করে ও শেষ অবধি তের জন স্ত্রীলোক ও আঠার জন পুরুষের জীবন বিপন্ন করিয়া হিপ্নটিজ্মের সাহায্যে হীরকটি পুনরুদ্ধার করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাটি লইয়াই নাটিকাটি রচিত। যে দিন শ্রীমতী ফিফি হীরক-চোর ইয়াঙ্কির সহযোগিনীরূপে জৈন সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া বহু ঘণ্টা চিত্রে ছটফট করিবেন সেই দিন চিত্র উঠাইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁর নিদারুণ মাথা ধরিল। তিনি অ্যাস্পিরিন খাইয়া শুইয়া থাকিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁর দেখা হইল আবেদনের সহিত। আবেদন ব্যাপার কি শুনিয়াই বলিল, "আরে করছ কি ? ওতে কিছু হবে না। তুমি এক ডোজ নক্স্ভমিকা সিক্স্ খেয়ে শুয়ে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।" ফিফি তার কথায় নক্স্ভমিকা সেবন করিয়া শুইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁর মাথা-ধরা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সব বন্দোবস্ত ঠিক, একস্ট্রা লোকেরা ষ্টেজে আসিয়াছে। ম্যানেজার, ব্যস্তসমস্ত হইয়া ফিফির খোঁজ করিতে পাঠাইলেন। ফিফির তখন নড়িবারও শক্তি নাই। সে দিন ছবি তোলা হইল না এবং তাহাতে ফিফির কিছু আর্থিক ক্ষতি হইল। ইহাতে ফিফির সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল আবেদনের উপর। তিনি আবেদনকে একটা প্রকাশ্য স্থলে নির্ব্বোধ ও হাতুড়ে বলিয়া খুব গালি দিয়া দিলেন। আবেদন পুনর্ব্বার হোমিওপ্যাথির জন্য লাঞ্ছিত হইয়া শোকে আজ আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে সিনেমার কার্য্যে তখনি ইস্তফা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার আর কালিফোর্নিয়ায় থাকিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা রহিল না। সে সেই দিনই কোথাও চলিয়া যাইত ; কিন্তু যাইবেই বা কোথায় ? তাহা ব্যতীত কয়েক দিন হইতেই তাহার বুড়ো আঙ্গুলে একটা ভীষণ ব্যথাও হইয়াছিল। তাহাতেও সে বিশেষ কাবু ছিল।

আঙ্গুলে আঙ্গুলহাড়া লইয়া আবেদন একাকী কালিফোর্নিয়ার এক নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া আসে। ভীষণ টন্টনে ব্যথা। যাতনায় বেচারার মুখখানা নীল উঠিয়াছে, কিন্তু কিছু না বলিয়া সে একমনে দূরের কতকগুলি গাছপালার দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিতেছে কেন সে এই নিজদ্বেশে হতাদর হোমিওপ্যাথির জন্য এত কষ্ট করিল! তার আঙ্গুলটা টন্টন্ করিয়া উঠিল। মনে হইল, বেলেডোনা থার্টি। কিন্তু না, আর এ জীবনে হোমিওপ্যাথির সে ছায়াও মাড়াইবে না। এমন সময় পিছন হইতে মজার গলায় কে বলিল, "হিন্দু ম্যান ভেলি সলি ?" (হিন্দু মানুষ অতিশয় দুঃখিত ?)

আবেদন কপালকুণ্ডলার আহ্বানে সচকিত নবকুমারের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, এক জন চীনা তাহাকে সম্বোধন করিতেছে। অল্প আলাপেই লাং চি ফং বুঝিয়া ফেলিল যে আবেদন আমেরিকার কুব্যবহার পাইয়া মর্ম্মাহত ও আঙ্গুলে তাহার আঙ্গুলহাড়া হইয়াছে। লাং চি ফং বলিল, "মি দক্তল্ গিব মেদিসিন" (আমি ডাক্তার ঔষধ দিব)।

আবেদন তাহার সহিত চলিল। কিছু দূর গিয়া লাং চি ফং চীনা ভাষায় আনন্দজ্ঞাপক একটা চীৎকার করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া প্রান্তরের মধ্যে দৌড়িয়া চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বেই কয়েকটা গাছগাছড়া হাতে করিয়া আবেদনের নিকট আসিয়া বলিল, "তু মিনিৎ কিওর্" (দু মিনিটে রোগশান্তি)। লাং চি ফং পাতাগুলি চিবাইয়া আবেদনের আঙ্গুলে লাগাইয়া দিবার দুমিনিটের মধ্যে সত্য সত্যই তার ব্যথা একেবারে সারিয়া গেল। আবেদন অবাক! সে লাং চি ফং-কে অনেক ধন্যবাদ দিল এবং অন্য কোন কাজ না থাকায় তাহার সহিত তাহার বাসায় চলিল। আবেদন দেখিয়া শুনিয়া বুঝিল যে চীন দেশটি খুব প্রকাণ্ড, তাহার সভ্যতা অতি প্রাচীন এবং দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সকল বিষয়েই চীনারা পৃথিবীতে অগ্রগামী। সে স্থির করিল চীন দেশে গমন করিবে।

লাং চি ফং আবেদনকে চীনা ভাষায় কয়েকটি কথা, একটি চীনা পোষাক ও কয়েক জন চীনা ভদ্রলোকের নিকট পরিচয়পত্র দিয়া তাহাকে দুই তিন সপ্তাহ পরে এক দিন চীন দেশে রওয়ানা করিয়া দিল। যাত্রার পূর্ব্বে আবেদন কাকাকে লিখিল, "যে চীন সভ্যতার চরমে পৌঁছাইয়া সহস্রাধিক বৎসর হিমালয়ের মতন স্থিরভাবে চঞ্চল বহির্জ্জগৎকে কৃপা-কটাক্ষে দেখিতেছে, সেই চীন আজ আমায় ডাক দিয়াছে। আমি চলিলাম। পিতা সন্তান-পূজা করিয়া আজ আমায় জগতের চক্ষে হাস্যাস্পদ করিয়া গিয়াছেন, আবার ভ্রাম্যমান হইলাম, দেখি পূর্ব্বপুরুষ-পূজা-নিমগ্ন চীন আমায় কোন্ শিক্ষা দান করে!"

॥০

পিকিংএ পৌঁছিয়া আবেদন দিন কতক ঘোরাঘুরি করিয়া দেখিল যে চীনাদিগের কোন কোন মহাপুরুষের মধ্যে জাতীয়তার প্রাণ জাগ্রত রহিয়াছে। নবীন চীনা-দলের প্রাণ লিয়াং চি চাও দার্শনিকশ্রেষ্ঠ কু হুং মিং এবং নাট্যকার ও অভিনেতার রাজা বর্ত্তমান চীনের শেক্স্পিয়র মে লাং ফং প্রথমত আবেদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। আবেদন একটা কার্ডে নিজের নাম তাহার নীচে "ভ্রমণকারী ও উৎকর্ষিত স্বেচ্ছাসেবক" (Tourist and Volunteer Servant to the Cause of Culture) এই কথাগুলি ছাপাইয়া

লইয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার মহাপুরুষ-দর্শনের কাহিনী সে নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিতে

তু মিনিং কিওল্

লাগিল। লিয়াং চি চাও তাহাকে বলিয়াছিলেন, "হে নবীন ভারতবাসী, তোমরা ব্রাহ্মণ ও মন্দির তুলিয়া দাও এবং প্রতি গৃহে মন্দির ও প্রতি প্রাণে ব্রহ্মণ্য প্রতিষ্ঠিত কর।"

আবেদন তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, তবে আমি বলি দুই প্রকার বন্দোবস্তই থাকুক।"

মেলাং ফং-কে ভারতীয় নাট্যকলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন যে, উহা শুধু ভারতীয় নহে এবং নাট্য নহে আর সকল-কিছুই উহা হইতে পারে। তাঁহাকে আবেদন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আপনি ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাবে বিশ্বাস করেন?" মেলাং ফং বলিলেন, "কোন প্রভাবের কথা আমি বলিতেছি না, কথা হইতেছে অভাবের।"

কু হুং মিংকে আবেদন সাংখ্যদর্শনের বেদনার চিরনিবৃত্তির চেষ্টা ও টাও দর্শনের 'পথ' সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলায় তিনি কিছু বলেন নাই, শুধু শিরঃসঞ্চালন করেন। আবেদন তাঁহাকে বলিয়াছিল যে তিনি যদি এই দুই দর্শনের মিশ্রণে টাংখ্য-দর্শন নাম দিয়া কোন নূতন মত প্রচার করেন, তাহা হইলে সে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। কু হুং মিং পুনর্ব্বার উভয় দিকে শিরঃসঞ্চালন করিলেন।

এইরূপ অনেক ইন্টারভিউ-(সাক্ষাৎকার)-এর কাহিনী আবেদন বাংলা দেশের পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পাঠাইয়াছিল।

সে সুপ্রসিদ্ধ চীনা অন্ধ ও দর্শনবিৎ বেতলাং লাশেংকে কেমন তর্কে কোণঠাসা করিয়াছিল, চীনের সর্ব্বপ্রধান সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক লোমাং লোলাং তাহাকে কেমন করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া সোইয়া-শিম সিদ্ধ খাওয়াইয়াছিলেন ও চীনা অভিনেতা কা চা লং কি কারণে জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, এই সকল কথা আবেদনের লিখিত বিভিন্ন ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে প্রাপ্তব্য। কিন্তু চীন দেশের সকল-কিছুর মধ্যে আবেদনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল চীনা সঙ্গীতটি ভাল করিয়া আয়ত্ত করা।

॥৵০

চীন-সম্রাট্ ফুসি খ্রীঃ পূঃ ২৮৫২ অব্দে সঙ্গীতের আবিষ্কার করেন। চীনারা সঙ্গীতকে জীবনে যত উচ্চ স্থান দিয়াছে পৃথিবীর অপর কোন জাতি সেরূপ দেয় নাই। তাহাদের মতে সুস্বর-লহরীর ক্ষমতার অতীত কিছুই নাই। স্বরবিন্যাসের সাহায্যে মানব-হৃদয়কে যে-কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়। এমন কি, এই যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চীনারা নিজেদের সভ্যতার ক্ষেত্রে অচল স্থির ও শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে, চীনার চিত্তবিকারের মহৌষধ চীন-সঙ্গীত। আবেদন এই সঙ্গীতের নাকি সুরের সাময়িক কষ্টকারিতা ও ঘণ্টা ও ঢক্কা নিনাদের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ইহার অন্তরের মাধুর্য্যের স্বাদ গ্রহণ করিবেই বলিয়া মনস্থ করিল। সে তিন মাস কাল চীনা স্বর ও তাল সাধন করিল এবং স্ত্রীলোক-বর্জ্জিত চীনা রঙ্গমঞ্চের আটঘাট আরও দুই মাস ধরিয়া চিনিয়া

লইল। তার ইচ্ছা ছিল চি'ন, শে, লাপা, পিপা প্রভৃতি চীনা বাদ্য-যন্ত্রগুলিও আয়ত্ত করিবে, কিন্তু এক দিন যখন সে মহামতি লোমাং লোলাংএর কাছে যাইবে এরূপ মনস্থ করিতেছে, ঠিক সেই সময় একটা কেব্‌ল্‌গ্রাম আসিল যে তাহার কাকা গতায়ু হইয়াছেন। আবেদন ছিল তাহার কাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং তাহাকে প্রথম যে জাহাজটি পাওয়া গেল তাহাতেই দেশে ফিরিতে হইল। সঙ্গে রহিল কয়েকটি চীনা বাদ্যযন্ত্র ও কয়েকখানা ভ্রমণবৃত্তান্ত-পূর্ণ ডায়েরী।

।৵০

জাহাজে আবেদনের একটি বান্ধবী জুটিয়া গেল। তাঁহার বাস ফিলিপাইন দ্বীপে। আবেদন প্রত্যহ তাঁহার সহিত জাহাজের ডেকে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প ও আলোচনা করিত। সে যে কেন বিদেশে আসিয়াছিল, দেশে ফিরিয়াই বা সে কি করিবে ইত্যাদি সকল কথা সে এই ফিলিপাইন-দেশীয় মহিলাটিকে বলিত। ফিলিপিনো মহিলাটির মতে আধুনিক জগতের সকল দুঃখের মূলে রহিয়াছে পরের উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা ও পর-দাসত্ব দোষ।

আবেদন বলিল, "না, আমার মনে হয় এই যে, সকল দেশের সকল মানুষের ভিতরেই দেখা যাইতেছে যে, প্রাণের যা আকাঙ্ক্ষা ও আবেদন তাহা উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করিতে কেহই পারিতেছে না, সকলেই অন্তরে নিহিত অব্যক্ততার বোঝা বহন করিয়া গুমরাইয়া মরিতেছে, ইহাই আমাদিগের সকল শোকের মূল। উপযুক্ত অভিব্যক্তির উপায় ও পথ পাইলেই মানব সুখের চরমে পৌঁছাইবে।"

বান্ধবী বলিলেন, "এ উপায় কি তুমি মানুষের ভাষার প্রসার ও নববৈচিত্র্যের ভিতর পাইবে, না নৃত্যে পাইবে, না কর্ম্মে পাইবে?" আবেদন বলিল, "না, ও সকলের ভিতর মানুষ শুধু তার ব্যর্থতার বেদনামাত্র প্রকাশ করিতে পারে। মনের অর্গল উহাতে সম্পূর্ণ খোলে না। উপযুক্ত সঙ্গীতেই একমাত্র মুক্তির পন্থা। স্বরসাধনের ভিতর দিয়াই মানুষ আত্মাকে সৈনিকের ন্যায় শিক্ষিত ও গতিদক্ষ করিয়া তুলে।"

বান্ধবী বলিলেন, "তবে কি তুমি সঙ্গীতের সাহায্যে বিশ্বে নব জাগরণ আনিতে পারিবে ভাব?"

আবেদন বলিল, "হাঁ, সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই আত্মাকে যে কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়। চীন্ দেশে দেখ, সঙ্গীত সাগরের ন্যায় কখন চঞ্চল, কখন উচ্ছৃঙ্খল, কখন শান্ত, কখন নিঃশব্দপ্রবাহিত, এমনি নানাভাবে চির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চীনা আপনার হৃদয়ের সকল আবেগের নিবৃত্তি তাহার সঙ্গীতেই পাইতেছে। তাই বাহিরের সকল ঝঞ্ঝাকে উপহাস করিয়া সে জীবন যাপন করিতে পারে।"

বান্ধবী তাহার কথা এইরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিতেন ও আবেদন অনর্গল বলিয়া যাইত। জাহাজ ভারতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

৩৭॥

দেশে ফিরিয়াই আবেদন একেবারে নন্‌-কো-অপারেশনের আবর্ত্তে পড়িয়া গেল। সে দিন কতক এখানে ওখানে বক্তৃতা দিল; দুই একটা ভারতীয় ও চীনা সঙ্গীত মিশ্রিত গানের মজলিশও করিল; কিন্তু দেখিল যে দেশের প্রাণ যে মহাত্মা গান্ধী, তাঁহাকে জাগ্রত করিতে না পারিলে কোন লাভ হইতেছে না। অসহযোগের আদর্শ তাহার ভালই লাগিয়াছিল। ভারত গভর্মেণ্ট হিন্দু সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি উভয়ের প্রতিই আবহমানকাল হইতে দারুণ অনাদর দেখাইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং সেই গভর্মেণ্টের প্রতি আবেদন যে সহজেই বীতরাগ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

আবেদন একটি হ্যাণ্ডব্যাগ লইয়া আহমেদাবাদ যাত্রা করিল। সেখানে অল্প চেষ্টা করিতেই এক দিন সে গান্ধীজির সাক্ষাৎলাভে সক্ষম হইল। তিনি আবেদনকে বৈকাল পাঁচ ঘটিকার সময় আসিতে বলিলেন। আবেদন সেদিন একটি খদ্দরের ধুতির উপর একটি খয়ের রঙের খদ্দরের কোট এবং মস্তকে বাসন্তী রঙের একটি গান্ধীক্যাপ পরিধান করিয়া নোট বই ও পেন্সিল পকেটে গান্ধীজির আশ্রমে উপস্থিত হইল। প্রণাম ইত্যাদির গোলমাল মিটিলে পরে মহাত্মাকে আবেদন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সঙ্গীতের শক্তিতে বিশ্বাস করেন?"

মহাত্মা বলিলেন, "হাঁ, সঙ্গীত মানুষকে সুখ দুঃখ উভয়ই দানে বিশেষরূপে ক্ষমতাপন্ন, একথা আমি স্বীকার করি।" আবেদন বলিল, "না, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারেন নাই। সঙ্গীতই যে মানুষকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার ও তাহাকে চরিত্রে ও কর্ম্মে অটল ও সক্ষম করিয়া তুলিবার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, একথা কি আপনি মানেন?"

মহাত্মা বলিলেন, "কিরূপে ইহা সম্ভব আমায় বুঝাইয়া বলুন।"

আবেদন বলিল, "ধরুন, আপনার অসহযোগ আন্দোলন। ইহার জন্য আপনি কত বক্তৃতা, কত লেখা, কত তর্ক করিতেছেন। এ সকল, প্রথমত, সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষকে অসহযোগী করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় না; দ্বিতীয়ত, যদি কোন উপায়ে মানুষের **অন্তরেই** আপন হইতেই অসহযোগী আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা বাহির হইতে অসহযোগ প্রচার করিয়া অর্দ্ধ-সক্ষম হওয়া নিশ্চয়ই শ্রেয় নহে—।"

মহাত্মা বলিলেন, "উত্তম কথা। কিরূপে এই অসহযোগ-আবেগ মানুষের মনে যুক্তিতর্ক না দিয়াই জাগাইয়া তোলা সম্ভব, তাহা বলুন।"

আবেদন বলিল, "হিন্দু-সঙ্গীতের এক একটি স্বর এক একপ্রকার আবেগ প্রাণে

জাগ্রত করিয়া তোলে। যথা সা শান্ত ভাব, রে করুণা, গা তন্ময় প্রেম, মা ভয়, পা সৎসাহস, ধা পরার্থপরতা, নি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা এবং এই সকল স্বরের কড়ি কোমল ও পরস্পর মিশ্রণের সাহায্যে যে কোনভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলা যায়। তাহার জন্য যুক্তি লাগে না, তর্কও লাগে না। আমি নি-বর্জ্জিত পা-গা-প্রধান একটি রাগিণী রচনা করিয়াছি। ইহার নাম দিয়াছি অসহযোগিয়া রাগিণী। ইহার স্বরতরঙ্গে যে একবার পড়িবে সে আর কখন বিদেশীর সহিত সহযোগে কিছু করিতে চাহিবে না। যেমন বহ্নি ঊর্দ্ধগামী ও জল নিম্নগামী স্বভাবতই হয়, তেমনি এই রাগিণীর স্পর্শে মানব-হৃদয় স্বভাবতই এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে তাহার পক্ষে স্বভাবতই ব্যথার ব্যথী ব্যতীত আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা সম্ভব হয় না। আমার অনুরোধ, আপনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি এই সুরের আগুন জ্বালাইয়া দিন। দেখুন, অচিরে কি অপরূপ ফল আপনি পাইবেন।"

মহাত্মা আবেদনের সকল কথা শুনিয়া উদ্ভাসিতবদনে একবার হাস্য করিলেন।

তার পর নিজের টেকোটি বাহির করিয়া কিয়ৎকাল কোন কথা না বলিয়া সস্মিতমুখে সুতা কাটিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আবেদনকে তিনি একগাছি সুতা স্বহস্তে উপহার দিলেন। একজন চেলা আবেদনকে বলিল, "বাবুজি, এইবার চলুন।"

আবেদন মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া গেল।

আহমেদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবেদন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাসায়নিকশ্রেষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্র তাহার অসহযোগী রাগিণীর কথা শুনিয়া তাহার বুকে জোরে জোরে কয়েকটা ঘুসি মারিয়া বলিলেন, "ইয়ংম্যান, তোমার তো দেখছি গায়ে বেশ জোর আছে—তুমি খদ্দর বিক্রি ক'রে বেড়াও; পারবে।" আবেদন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নিকটে সে খদ্দর ছাড়িয়া রেশমের একটি চীনা কোট পরিয়া গমন করিল। আচার্য্যকে আবেদন অনুরোধ করিল যে, তিনি যেন উদ্ভিদের উপর রাগ-রাগিণীর প্রভাব তাঁহার আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফের সাহায্যে যাচাই করিয়া দেখেন। আচার্য্য সে কথায় বিশেষ কান না দেওয়াতে আবেদন রাগতভাবে বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর সহিত দেখা হইল। আবেদন তাঁহার সহিত বহুক্ষণ গাড়ীতে বসিয়া আলাপ করিল এবং শেষ অবধি তাঁহাকে বলিল যে প্রত্যেকটি সুরের মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীণ ডাক্টলেশ গ্লাণ্ডের কার্য্যের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব আছে, তিনি এ বিষয়ে এক্স্‌পেরিমেণ্ট করিয়া দেখিলেই সকল কথা বুঝতে পারিবেন। অমায়িক ডাক্তারবাবু তাহাকে বলিলেন, "অবশ্যই হইতে পারে। তবে কিনা এবিষয়ে এক্স্‌পেরিমেণ্ট করা কঠিন।" আবেদন তাঁহাকে এ বিষয়ে আর পীড়াপীড়ি না করিয়া নিজ স্থানে গমন করিল।

মহাত্মা গান্ধী হাস্য করিলেন

মহাত্মা গান্ধীর ও অন্যান্য লোকদিগের নিকট কোন উৎসাহ না পাইয়া আবেদন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সেখানে বিশ্বকবি তাহার ভ্রমণ প্রভৃতির কথা শুনিয়া তাহাকে সাদরে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "আপনি তো আমেরিকা ও চীন অনেক ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, জগতের অনেক সমস্যার কথাও শুনিলেন; এখন এই যে জগদ্ব্যাপী দুঃখ ও দৈন্যের তাণ্ডব লীলা, ইহার শেষ কোথায় বলিয়া আপনি অনুমান করেন?"

আবেদন বলিল, "হিন্দু সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত আলাপ, তাহার সহিত চীনের ভাবমাত্রিক ছন্দের তালে তালে ঘণ্টাধ্বনি,এতদুভয়ের ঐক্যতানে যদি বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এবং শুধু তাহা হইলেই এই দুঃখদৈন্য প্রশমিত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

আবেদন বলিল, "যেমন আলোকের সম্মুখে অন্ধকার আপনা হইতেই মিলাইয়া যায়, তেমনি এই ঐক্যতানের স্বরজ্যোতিঃপ্রসূত হৃদয়াবেগের সম্মুখে অপরাপর মনোভাব কোথায় যে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার কূল কিনারা মিলিবে না। আমরা যদি যথাযথ স্বরবিন্যাসে নূতন নূতন ভাবোদ্দীপক রাগরাগিণী সৃজন করিতে এবং ভারতীয় সঙ্গীতের তালের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহা চীনা তালে গাহিতে পারি, তাহা হইলে কি না হইতে পারে?"

রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী গায়ক বলিয়া উঠিলেন, "মশায়ের দেখছি তালের উপর বড় রাগ। কেন, অপরাধ?"

আবেদন বলিল, "ভারতীয় তাল ভাবকে, মনের দরদকে তাহার শেষ সীমা অবধি যাইতে দেয় না। উদ্দীপনার অর্দ্ধপথে তাল তাহার মস্তকে সমের মুগুর বসাইয়া সকল-কিছু ভণ্ডুল করিয়া দেয়। চীনারা সুরকে খেলাইয়া খেলাইয়া চরমে লইয়া যায়; স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে এ সুরের নেশা চরমে পৌঁছিতে কম-বেশী সময় লাগিয়া থাকে। যখন চীনা তালজ্ঞ ভাব চরমে পৌঁছিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে, শুধু তখনই সে ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ভাবের ঢেউ নিম্নগামী করিয়া দেয়। আবার ভাবের অভাব যখন চরমে পৌঁছায় তখন সে আবার ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ঢেউএর গতি পুনর্ব্বার ফিরাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে সুর ফাঁক তাল ধা ঘেনে নাগ্ দিগ্ বা চৌতালের ধা ধা দিন্ তা, এ জাতীয় কোন বন্ধনের উৎপাত নাই।"

আবেদনের কথা শুনিয়া তাহার আলোচকের মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া কবি তাঁহাকে অন্য কথায় ভুলাইবার জন্য বলিলেন, "ঢেউও তো তার নিজের নিয়মে বাঁধা। সে কি কখন নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সমচতুষ্কোণ-আকার ধারণ করিতে পারে? যেমন তার নিজের স্বভাবের বন্ধনের মধ্যেও ঢেউ পূর্ণতা পাইয়া থাকে, তালের বন্ধনের মধ্যেও সুর তেমনি বিকাশের চরমে পৌঁছাইতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত...ওস্তাদটি বলিলেন, "আপনাকে পুলিসে দেওয়া উচিত!"

আবেদন বলিল, "আপনার উপমা চমৎকার; কিন্তু আমার যুক্তি আপনি বুঝিলেন না। যুক্তি ও উপমা এক নহে। তাল স্বরের স্বভাব নহে......"

সঙ্গীতজ্ঞ লোকটি কথা শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আপনাকে পুলিসে দেওয়া উচিত!" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই সকলে আবেদনকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া সন্দেশ রসগোল্লা সরবৎ ইত্যাদিতে তুষ্ট করিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। আবেদন প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর প্রসিদ্ধ লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না; নিজেই সে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে।

৸০

বাঙালীর একটি গুণ আছে। সে সকল ব্যক্তি ও মতকেই কিছু দিনের মত আকাশে তুলিয়া ধরিতে কখনও নারাজ হয় না। আরব্যোপন্যাসে কে যেন শুধু এক দিনের জন্য রাজা হইতে চাওয়াতে সম্রাট্ হারুন-অল-রসিদ তাহাকে সানন্দে এক দিনের জন্য নিজের সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে সম্রাটের ঔদার্য্যই প্রমাণ হয়। বাঙালীও এই ঔদার্য্য-গুণে গুণী। যে কেহ উচ্চকণ্ঠে যাহা হইতে চায়, সে তাহাকে ক্ষণতরে তাহাই হইতে দেয়। এইরূপে বাংলায় নিত্যই নব নব বাল্মীকি, তানসেন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, কালিদাস, ভবভূতি, হুইটম্যান, গর্কী ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। তাঁহারা আসেন যান মাত্র দুদিনের জন্য। কাজেই বাঙালী তাঁহাদের আশায় নিরাশ করে না। এই সকল ক্ষণপূজিত মহাপুরুষদিগের মধ্য হইতেই আবার কেহ কেহ চিরকালের দেবতারূপে থাকিয়া যান। সে কথা থাকুক।

আবেদন যখন কয়েকটি মেস ও কলেজ হোষ্টেলে যাইয়া নিজের মত প্রচার এবং তৎসঙ্গে হারমোনিয়ম তানপুরা ও চীনা ঘণ্টা সহযোগে স্বরচিত সঙ্গীত ও পররচিত সঙ্গীতের নূতন সুর আলাপন করিয়া সকলের চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়া উঠিল, তখন অতি শীঘ্রই সে ছাত্রমহলে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। এমন কি, কয়েক মাসের মধ্যেই সে রাস্তায় বাহির হইলে লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিত, "ঐ ঐ দেখ আবেদন পাকড়াশী যাচ্ছে।" মফস্বল হইতেও ছোকরারা আসিয়া তাহার গান শুনিত এবং কলিকাতার ছোকরাদিগের সহিত একজোটে হাততালি দিত। আবেদনের গানের মজলিশ শীঘ্রই সহরে ও বাহিরে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। সা রে গা মা পা ধা নি নির্ব্বিশেষে সে যে-কোন স্বরপ্রধান রাগিণীরই আলাপ করুক না কেন, তাহার ফলে শুধু দেখা যাইত শ্রোতাদিগের উদ্দাম উৎসাহ ও আবেদনের প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তিপ্রকাশ। এক জন ইতিহাসের ছাত্র বলিয়াছিল, "বর্ত্তমান কালকে আবেদনের যুগ (The Age of Abedan) বলা যাইতে পারে।"

৸৹

চারিদিকে স্কুল কলেজের ছাত্রদের ভিড়। সকলেই ঘাড় উঁচাইয়া কি যেন দেখিতেছে, কাহার যেন আশায় রহিয়াছে। হঠাৎ বৃহৎ হলের দরজা খুলিয়া গেল এবং নানা বর্ণের পাঞ্জাবি পরিধান করিয়া ও দীর্ঘ কেশকলাপে মুখশ্রী বাড়াইয়া কয়েক জন ভক্ত আবেদনকে ঘিরিয়া বক্তৃতা-মঞ্চের উপর আনিয়া বসাইল। সকলে করতালি দিয়া উঠিল। আবেদন ঈষৎ লজ্জায় মুখ আলোকিত করিয়া শ্রোতাদিগের দিকে চাহিয়া এক বার তাহাদের অভিবাদন করিল। সকলে নিস্তব্ধ হইলে আবেদন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ আমরা……"

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গান, গান।" আবেদন পার্শ্বের এক জন ভক্তকে ইঙ্গিত করিল, একটি হারমোনিয়ম পোঁ করিয়া উঠিল, দুটি তানপুরা ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও করিয়া সুর ধরিল—আবেদন তাহার নব রচিত সরমিয়া রাগিণীতে (পা নি বর্জ্জিত ঔড়ব, গা বাদী, মা সম্বাদী, দুই গা ইত্যাদি) গান ধরিল—

সরমে গরম হইল গাল,
কপাল ও কর্ণমূল লাল,
হায় সখা মোর ঘোমটা খুলিয়া দেখো না।
পায়ে ধরি সখা অধরে অধর রেখো না॥

সকলে "বা ভাই, বা ভাই," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আবেদন অধিক দরদ দিয়া গাহিল,—

অধরেঁ এঁ এঁ এঁ অঁ···ধঁ···রঁ···রেখো না

অমনি ঢং করিয়া এক জন ভক্ত ঘণ্টাটি বাজাইয়া দিল। আবার তুমুল করতালি। আবেদন উঠিয়া দাঁড়াইল। কি বলিতে গেল, কিন্তু সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গান, গান।" পিছনের বেঞ্চিতে জায়গা লইয়া তিন চার জনে মারামারি হইয়া গেল। সকলে বলিল, "মার, মার, বের ক'রে দাও, দূর ক'রে দাও!" আবেদন গান ধরিল—

আমার হৃদয়-সরসে কি ফুটালে সখি
রক্ত কমল-কলিকা,·········

গান থামিতেই হলের এক প্রান্ত হইতে কে বলিয়া উঠিল, "একটা রবি ঠাকুরের গান হোক।"

আবেবন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ব্যাপার হচ্ছে কি, তাঁর গানে অনেক স্থলে কথার সহিত সুরের সামঞ্জস্য নাই। আমি কিছু সুর বদলাইয়া একটি গান গাঁহিতেছি।" এই কথা বলিয়া সে গান ধরিল—

"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে"

এবং বলিল, "এই যে রকম সুরে গাহিলাম, ইহাতে আসন পাতার ভাব ঠিক প্রকাশ পাইতেছে না। 'আসনখানি পাতি' এই কথাগুলি এই রকম সুর করিলে ভাবটা অনেক পরিষ্কার হয়।"

নূতন সুরটি করিতেই এক জন লম্বা চৌড়া কৃষ্ণবর্ণ ও বৃষস্কন্ধ যুবক আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি কোন্ অধিকারে এ রকম অপরের গানের সুর বিকৃত করিয়া গাহিতেছেন।" সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল এবং ধস্তাধস্তি করিয়া যুবকটিকে হল হইতে বাহির করিয়া দিল।

এইরূপে দিনের পর দিন মজলিশ, সভা, আড্ডা ইত্যাদির ভিতর দিয়া আবেদন বাঙালীর বুকে নিজের আসন চিরস্থায়ী করিয়া লইতেছিল। তার পর এক অশুভক্ষণে সে কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ-পাগল বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া নাট্যের দিকে মন নিয়োগ করিল।

৸৶০

বন্ধুরা বলিল, "আবেদন, যদি সমাজকে তাহার ভিত্তি অবধি নাড়া দিতে চাও, তাহা হইলে রঙ্গমঞ্চের দিকে মন দাও। নাট্যে বাঙালী যেমন মজিবে, আর কিছুতেই তেমন হইবে না।"

আবেদন বলিল, "কিন্তু আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চ আর নাট্যকলা না ভারতীয়, না নাট্য; তাহার ভিতর যাওয়া কি আমার পক্ষে সমীচীন হইবে?"

বন্ধুরা বলিল, "রঙ্গমঞ্চ তো তোমার হাতে, তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া ঠিক করিয়া লও, সীন, ষ্টেজ, নাটক, অ্যাক্টর, অ্যাক্ট্রেস সব নিজে ঠিক কর।"

আবেদন বলিল, "অ্যাক্ট্রেস? অ্যাক্ট্রেস তো একেবারে বাদ। চীন জাপানে নটীর স্থান নাই। মা চালং, যাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাশালী অভিনেতা চীনে গত তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্মায় নাই, তিনি আমায় নিজে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক স্বভাবতই সকল কার্য্যে অভিনয় করিয়া থাকে বলিয়া তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অভিনয় করা সম্ভব নহে। নাট্য আমাদের নিজেদের লিখিয়া লইতে হইবে এবং সীন প্রয়োজন নাই। ষ্টেজ এবং বাদ্যকরদিগের বসিবার স্থান থাকিলেই চলিবে। প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্ব্বে এক জন চীৎকার করিয়া দর্শকদিগকে বলিয়া দিবে, কি প্রকার অবস্থায় দৃশ্যস্থিত ঘটনাবলী ঘটিতেছে। দর্শকগণ সীন কল্পনা করিয়া লইবে।"

সকলে বলিল, "ঠিক বলিয়াছ। এই তো যথার্থ আর্ট। ইহাতেই মনের প্রসার বাড়িবে। কি বিষয়ে নাটক লিখিবে?" আবেদন বলিল, "প্রণয়। প্রণয়ের উচ্চ আদর্শ মানুষের নিকট খাড়া করিতে পারিলে সমাজের বহু উন্নতি হইবে।" বন্ধুরা

বলিল, "ঠিক বলিয়াছ; প্রণয়ই ঠিক হইবে। সীতা, সাবিত্রী, সতী, ইহার মধ্যে একটা কিছু লও।"

উত্তর হইল, "উহুঁ।"

"তবে বেহুলা, ফুল্লরা, খুল্লনা কিম্বা সংযুক্তা?"

"উহুঁ।"

"দময়ন্তী, শকুন্তলা, কপালকুণ্ডলা?"

"উহুঁ, ওসবে হবে না। নির্য্যাতন সহ্য করা চাই, প্রণয়ের জন্য পাগল হওয়া চাই।"

তখন এক বন্ধু গাণ্ডীবপ্রসাদ বলিল, "তবে সূর্পণখার লক্ষ্মণ-প্রেমের বৃত্তান্ত লইয়া তোমার নাটক লিখ। সূর্পণখার ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনীতে পাষাণও গলিয়া যায়। কর্ত্তিতনাসা ও কর্ত্তিতকর্ণ সূর্পণখা যখন পাগলের ন্যায় বিলাপ করিবে, তখন দর্শকগণ নিশ্চয়ই বিশেষরূপে মুভ্‌ড্‌ (moved) হইবে।"

আবেদন উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ঠিক বলিয়াছ। সূর্পণখাই ঠিক হইবে।"

তার পর কিছু দিন ধরিয়া নাটক-লিখনকার্য্য চলিল। আবেদন সূর্পণখার প্রণয়ের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করা লইয়া অনেকগুলি নূতন গান ও সুর রচনা করিল। তাহার মধ্যে কোমল গান্ধার ও কড়ি মধ্যমে রচিত একটা আর্ত্তনাদের সুর শুনিয়া গাণ্ডীব বলিল, "নিছক মার্টারডমের (আত্মবলিদানের) আওয়াজ।"

ইহার পর আরম্ভ হইল রিহার্স্যাল। আবেদন নিজে সূর্পণখা সাজিল; গাণ্ডীব সাজিল লক্ষ্মণ।

অভিনয়ের প্রথম রাত্রি ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। আবেদন 'চন্দ্রমা' থিয়েটারটি ভাড়া লইয়া ষ্টেজটি সকল সীন-বিমুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইল। কয়েক জন চীনাকে সে অভিনয় কালে অর্কেষ্ট্রা বাজাইবার জন্য নিযুক্ত করিল।

আবেদন স্ত্রীলোক সাজিয়া অভিনয় করিবে এবং নাসিকা-কর্ত্তিত রূপে গান করিবে শুনিয়া দলে দলে স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ টিকিট কিনিয়া থিয়েটারে হাজির হইল। প্রথম দৃশ্যে সূর্পণখা লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছে। তাহার হৃদয় উত্তেজনা ও অবসাদের আবেগে মুহুর্মুহু কম্পিত। চীনা অর্কেষ্ট্রার বাদকগণ সঘনে বেতালা ঘণ্টা-নিনাদ আরম্ভ করিল। টং টং, ঢঙ্গা ঢং, ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং শব্দে সকলের কর্ণ বধির হইয়া যাইবার সূচনা হইল। সকলে চীৎকার করিয়া চীনাদিগকে থামিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সে চীৎকারকে প্রশংসা ভাবিয়া আরও জোরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল; প্রথম দৃশ্য শেষ হইল। সকলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইণ্টারভ্যালের সময় সকলেই বলিতে লাগিল, "একে সীন নেই, তাতে এই ঘণ্টার গোলমাল, এ যেন দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে।" দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভেই এক জন আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "ভাবুন, গভীর

অরণ্যের দৃশ্য। কাঁটা বন ও শাল বৃক্ষ। পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র নদী। তাহাতে দুইটি কুম্ভীর ভাসিতেছে।" সকলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তার পর আবেদন স্থূর্পণখার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আসিয়া বিলাপ আরম্ভ করিল। তাহার ঈষৎ নাকি সুরের—

"কোথায় লক্ষ্মণ, কোথায় লক্ষ্মণ,
নিরাশা বুক করছে ভক্ষণ
অন্তরে আজ জলছে আমার ক্ষুব্ধ প্রেমের তৃষা।
কেমনে কাটিবে বল এ বিরহনিশা?"

সঙ্গীতে থিয়েটার পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে যখন আবার স-দরদে "হায় কেমনে এঁ এঁ এঁ" বলিয়া তান ধরিল এবং চীনারা ঘণ্টার সহিত একটা রেশমের সুতাবাঁধা যন্ত্রে 'কোঁও, কোঁও' আওয়াজ সুরু করিল, তখন গ্যালারির এক দল ছোকরা ষ্টেজে কতকগুলি কদলী ও লেবু নিক্ষেপ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যেই কে এক জন কাছাকাছি একটা বাড়ি হইতে টেলিফোনে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়া দিল যে চন্দ্রমা থিয়েটারে আগুন লাগিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া পড়িল। থিয়েটারের সামনের ছোকরার দল ব্রিগেডের লোকদিগকে বলিল, "হাঁ, থিয়েটারের ষ্টেজে আগুন লাগিয়াছে এবং ভিতরে সীন ইত্যাদি পুড়িয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।" ফায়ারম্যানরা তখন জলের পাইপ হস্তে জল চালাইয়া থিয়েটারে ঢুকিতে আরম্ভ করিল।

ভিতরে তখন দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। স্থূর্পণখা কর্তিত-নাসা হইয়া আর্তনাদ করিতেছে ও চীনারা উন্মত্তের ন্যায় ঘণ্টা ইত্যাদি বাজাইতেছে। প্রায় আগুন লাগারই মতন আওয়াজ চারিদিকে। কে এক জন, "আগুন, আগুন" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। তার পর প্রলয়। আছাড় খাইয়া, জল খাইয়া লোকে দরজার দিকে ছুটিল। এক দল ষ্টেজে গিয়া উঠিল, চীনারা উর্দ্ধশ্বাসে সব-কিছু ফেলিয়া পলায়ন করিল। রহিল শুধু ষ্টেজের এক কোণে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আবেদন। ফায়ারম্যানরা আগুন না পাইয়া চলিয়া গেল। বাহিরে টিকিট আফিসে দারুণ মারামারি টিকিটের পয়সা ফেরত লইবার জন্য। গাণ্ডীব আসিয়া বলিল, "আবেদন, বাড়ি চল।" আবেদন কলের পুতুলের মতই তাহার সহিত বাহির হইয়া গেল।

(সমাপ্তি)

থিয়েটারের ঘটনার পর দিন সকল কাগজেই এই ব্যাপার লইয়া খুব হৈ চৈ করিল। এ নাটিকার সাফল্যের আর কোন আশা রহিল না। আবেদন দেবতার

পর হইতে কিছু দিনের জন্য ছুটি লইয়া শিলঙে চলিয়া গেল। এক দিন সে দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। তার পর এক দিন সেই সাপ্তাহিকটিতে দেখিলাম—

আবার উধাও

শ্রীআবেদন পাকড়াশী।

ভূমিকা

পা... ই পুস্তিকাতে হ... ...তলা বাড়িখানা দেখছেন ওটি বাংলার বি...াই যে যন্ত্রণা পান তা নয়, ... বি. এল., ...হ কম্পিত হন। হসন্তবাবু ঐরূপ পা... অনে... করেছেন। C. S. P. C. A.এর ভারবাহী জীবের স্বাধ... অনুসন্ধান সভার সভারূপে হসন্তবাবু "Pyrotechnical Publicity and its ... Vertibrate Associates of the Vehicular Traffic on the Howrah Bridge and Elsewhere" নামে একটি প্রকরণ সভায় উপস্থিত করেন। ইহাতে হসন্তবাবু দেখিয়েছেন যে, অত্যুজ্জল আলোকমালাশোভিত সিগারেট, বিস্কুট প্রভৃতি দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ঔজ্জল্য ও খামখেয়ালী-রকম জ্বলা ও নিভার জন্য ভারবাহী ঘোড়া, গরু ও মহিষদের বিশেষ স্নায়বিক অনিষ্ট হয়। তাঁহার মতে, হয় ঐ সব বিজ্ঞাপন তুলে দেওয়া দরকার, নয় ঐ সকল জীবজন্তুদের জন্য নীল কাচের চশমার বন্দোবস্ত করা বিধেয়।

আর একটি পুস্তিকায় হসন্তবাবু দেখিয়েছেন যে, বঙ্গ দেশের জমির মাটির প্রকৃতির সহিত তাহার মহাপুরুষদের আবির্ভাব বিশেষরূপে জড়িত।...তিনি দেখিয়েছেন যে, হালিসহর (রামপ্রসাদ), নাম্ন... ...হিত তুলনীয়। Diagnosis(রোগানির্ণয় ...) রাধানগর (রা...)...কৎসা করা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার চেয়ে কি আর কম হ'ল? ... ই বলেন, "জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, পর্দ্দা, নিরক্ষরতা, পরাধীনতা, ম্যালেরিয়া,

(বঙ্কিমচন্দ্র) প্রভৃতি সকল স্থানের মাটিই এক প্রকার অর্থাৎ alluvial (পলিপড়া)। আর বেশী লিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। হসন্তবাবু যে এক জন অসাধারণ ব্যক্তি এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বলাকার 'ছবি' কবিতাটিকে "Theory of Relativity"র কাব্যানুবাদ প্রমাণ ক'রে কবি-মহলে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং ত্রিবন্দ্রম ও আরাবল্লি অঞ্চলে ভ্রমণ ক'রে রামায়ণটি তন্ন তন্ন ক'রে ষ্টাডি ক'রে "Recruitment and Mobilisation of Infantry in Ancient India"নামক প্রবন্ধ লিখে স্বয়ং জঙ্গি-লাটের ধন্যবাদ লাভে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীহসন্তচন্দ্র তরফদারের নাম জ্ঞানরাজ্যের সর্ব্বঘটে বিদ্যমান, তাঁর জ্ঞানচ্ছায়া "নর্শরি"র (চারাবাড়ির) মত বিভিন্ন জ্ঞানবৃক্ষের চারাকে পুষ্ট ক'রে বাড়িয়ে তুলেছে। বাৎস্যায়ন থেকে Havelock Ellis (হ্যাভেলক এলিস); বেদব্যাস থেকে H. G. Wells (এইচ. জি. ওয়েল্‌স); Plato (প্লেটো) থেকে Bertrand Russel (বার্ট্রাণ্ড রাসেল) Bergson (বার্গসঁ) ও Giovani Gentile (জিওভানি জেন্তিলে); Laotze (লাওটসে) ও Confucius (কনফুসিয়াস) থেকে Paul Richard (পল রিসার); Adam Smith (অ্যাডাম স্মিথ) থেকে ডাক্তার প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তানসেন থেকে কাজি নজরুল ইসলাম; Herodotus (হেরডোটাস) থেকে অধর মুখোপাধ্যায়; জৈন মহাবীর থেকে Jinarajadasa (জৈনরাজোদাস); চাণক্য থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ; বাণভট্ট থেকে যাদবেশ্বর তর্করত্ন; Michael Angelo (মিকেলেঞ্জেলো) থেকে হেমেন মজুমদার; পাণিনি থেকে লোহারাম শর্ম্মা; Homer (হোমার) ও Aristophanes (অ্যারিষ্টোফেনিস) থেকে Hillaire Belloc (হিলোয়ার বেলক) ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির মারফতে প্রাপ্ত সর্ব্ব দেশকাল-প্রসূত জ্ঞান-সম্ভার হসন্তবাবুর মস্তিষ্ক-মিউজিয়মে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

হরকুমার ব্যাকরণবাগীশ মহাশয় যখন জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হসন্ত রেখেছিলেন তখন তাঁর একবারও ব্যাকরণপূজা ব্যতীত অন্য কোন কথা মনে হয় নি। কিন্তু তাঁর প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র নিজের নামটি একের অধিক উপায়ে সার্থক করেছিলেন। হসন্তবাবুর শক্তি ছিল অনেক, যদিও সর্ব্বদাই কোন না কোন আদর্শ বা ব্যক্তির পিছনে ব্যঞ্জনবর্ণের পিছনে হসন্তের (্) মত লেগে থাকতেন। ব্যঞ্জনবর্ণবর্জ্জিত হসন্তের যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেহ জানে না, কোন মহাপুরুষের বা মহান আদর্শের সংস্রব-বর্জ্জিত হসন্তচন্দ্র তরফদারের অস্তিত্বও সেই রকম কেহ কল্পনা করে না। আত্মবিলোপ আর কাহাকে বলে? [illegible] সতত ভ্রমণ ক'রে শার্দ্দুল-[illegible]-বনানীর অনন্ত

'ন্যাশনাল ডিফারেন্সিয়া' ফাইলটাতে হসন্তবাবু আমাদের সকল প্রকার জাতীয় অনন্যসাধারণতার হিসাব রাখতেন। আমাদের জাতি অন্যান্য জাতির তুলনায় কোথায় কোথায় বিভিন্ন, কি কি দোষগুণ আমাদের আছে যা অপর জাতির নেই এই সবের খবর হসন্তবাবুর এই ফাইলটির মধ্যে পাওয়া যেত। চার পাঁচ বছর আগে শ্রীস্বামী অত্যুচ্চানন্দের পিছনে হসন্তবাবু কিয়ৎকাল যুক্ত ছিলেন। স্বামীজিই প্রথম হসন্তবাবুর দৃষ্টি আমাদের জাতীয়তা ও জাতীয় অবনতির দিকে আকর্ষণ করান। হসন্তবাবু তখনই বলেছিলেন যে, জাতীয় অবনতির কারণ প্রকৃষ্টরূপে নির্দ্ধারণ না ক'রে জাতীয় উন্নতির

হসন্তবাবু। প্রমাণ কি… … …?

হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার সহিত তুলনীয়। Diagnosis(রোগনির্ণয়)ই যদি না হ'ল, তাহ'লে চিকিৎসা করা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার চেয়ে কি আর কম হ'ল? যতই বলেন, "জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, পর্দ্দা, নিরক্ষরতা, পরাধীনতা, ম্যালেরিয়া,

হুকওয়ার্ম, তাড়িখানা, আফিম ও গাঁজা” হসন্তবাবু ততই বলেন, “প্রমাণ কি, যে ঐ সব কারণেই আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে? হর্ষবর্দ্ধনের সময় কি জাতিভেদ ছিল না? বর্ত্তমান রোমান ক্যাথলিক ও প্রাচীন প্রতাপশালী সাম্রাজ্যবান জাতিরা কি মূর্ত্তিপূজা করত না? আকবরের সময় কি পর্দ্দা ছিল না? রাণী এলিজাবেথের আমলে কি ইংরেজরা সকলে লেখাপড়া জানত? স্কচরা ও পোলরা পরাধীন হ'লেও তারা কি কখন আমাদের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছিল? ইতালীতে কি ম্যালেরিয়া নেই? অন্যদেশে কি হুকওয়ার্ম ও নেশা করবার মালমশলা নেই, না আমাদের দেশেই হুকওয়ার্ম ও নেশাহীনে লোকেরা খুব উঁচুদরের মানুষ?” ইত্যাদি। তর্কে হেরে গিয়ে স্বামীজি বললেন, “তবে এই দুর্দ্দশা, একি স্বয়ম্ভুব মহাদেবের প্রলয়লীলা?”

হসন্তবাবু ঈষৎ হেসে তখন বলেছিলেন, “না। Mythology, theosophy—groping in the dark (অন্ধকারে হাতড়ান)। ওসবে হবে না। চাই ঠিক মত ও যথেষ্ট পরিমাণে Statistics। Facts and Figures, বুঝলেন? আমায় facts and figures দিন, আমি আপনাকে জাতীয় উন্নতি অবনতি সব-কিছুর পরিষ্কার মীমাংসা করে দেব। Blue Print (ব্লু প্রিণ্ট) দেখে যেমন যন্ত্রের নাড়ী নক্ষত্র সব জানা যায় আমিও তেমনি ক'রে সব-কিছু আপনাকে দেখিয়ে দেব। কেবল চাই Statistics।”

সেই দিন থেকে হসন্তবাবু আমাদের জাতীয় দোষ গুণের যেখানে যা কিছু নিদর্শন পেতেন সব সযত্নে ফাইল-বদ্ধ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই উপায়ে বের ক'রে ফেলবেন কি কি বিষয়ে ও কি কি পরিমাণে আমরা অন্য জাতি অপেক্ষা বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতার মধ্যেই আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ খুঁজে বের করবেন। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর ব্যাপী কঠিন পরিশ্রম করে হসন্তবাবু হাজার জাতীয় বিভিন্নতার উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে ফেলেছেন। তাতে দেখা গেছে আমরা অতিভোজনপ্রিয়, ঘরোয়াবিবাদ-অভিলাষী, চলন্ত ট্রেনে ও ট্রামে ওঠা নাবার পক্ষপাতী, খালি পায়ে হাঁটা চলায় অভ্যস্ত, স্ত্রীনির্য্যাতক, মশক-দংশন-উদাসী ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিভিন্নতা পাওয়া গেছে আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে। তাঁরা ভয়-রোগে বিশেষরূপে ক্লিষ্ট। হসন্তবাবু আজকার 'কেস'টি সমেত ৪৫৫৩টি নারীর 'কাপুরুষতা'র উদাহরণ পেয়েছেন। কোথাও নারী ভয়-ব্যাকুলতার জন্য পুত্রকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় করেছে, কোথাও স্বামীকে বিপদে ফেলেছে, কোথাও কুপথগামী হয়েছে, কোথাও পিতার ব্যবসা ফেল পড়িয়েছে, কোথাও বাক্‌দত্ত প্রণয়ীকে বিবাহের জন্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতগ্রস্ত করেছে ইত্যাদি। সব দেখে হসন্তবাবু একটি সাময়িক কাগজে লিখেছিলেন—

হায় ভীত ভারত-ললনা,
তব দোষে দুষ্ট মোরা; সত্য কথা, নহে এ ছলনা!

অন্য জাতি বানিয়েছে কলকব্জা কত ;
মোরা কি সতত
থাকিব এ দুর্দ্দশায় নিমজ্জিত, হায় ?
দেশ যায় যায়।

ওঠ, জাগ, ভারতের মেয়ে,
সাহসের নিদর্শনে ফেল দেশ ছেয়ে,
বাঁধ কেশ, কোমর যতনে,
ভোল আজ মূর্চ্ছা ও পতনে।

জাগরণ চাই,
কাঁদিবে কাঁপিবে ভয়ে, সে সময় নাই।
হ'তে হবে বীরের জননী,
শুন সবে শুন হিন্দু ইন্দু-নিভাননী ;
তোমাদের ভয় ব্যাকুলতার বন্ধনে,
তোমাদের হৃদয়ের ক্রন্দন-স্পন্দনে,
কাতর ভারত আজ।

তাই তোরা "সাজ, সাজ"
ভারতের মেয়ে,
ছুটে আয় ভয় ভুলে ধেয়ে ?

কবিতাটি পড়ে সকলেই বলেছিল যে, হসন্তবাবু যদি সিরিয়াস্‌লি কবিতার চর্চ্চা করতেন তাহ'লে হয়তো জ্ঞানের রাজ্যের অনেক নীরসতাকেই সরস কবিতায় ব্যক্ত করতে পারতেন। তিনি যে অতি দুরূহ ব্যাপার কবিতায় পরিস্ফুট করতে পারেন তার প্রমাণ স্বরূপ হসন্তবাবু Kant's Critique of Pure Reasonএর এক অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে তর্জ্জমা করেন। এ ছাড়া বড় বড় ভাব ও অধিক জটিল ব্যাপার কবিতায় ব্যক্ত করার উদাহরণ স্বরূপ তিনি Plotinusএর Absolute Nons, Leibnitzএর Monad, Momentum, Anaphylaxis ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন।

যাই হোক, ভারতনারীর কাপুরুষতার এত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়ার ফলে হসন্তবাবু ভাবতে আরম্ভ করলেন যে, এইটিই আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ। বীরপ্রসবিনী ভারতমাতা যদি নিজে বীর না হন, তাহ'লে তাঁর বীরপ্রসব কার্য্য কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। মাতৃজাতিই শিশুকাল থেকে সন্তানের দেহ ও মনের পুষ্টি ও গুণাগুণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরাই যদি সাহসহীনতা দোষে দুষ্ট হন, তাহ'লে

শিশু কি ক'রে আর বীর পুরুষ হয়ে উঠতে পারে ? হসন্তবাবু ভাবতে আরম্ভ করলেন, কি ক'রে ভারতে আবার লক্ষ লক্ষ বীরজননীর সৃষ্টি করা যায়।

স্বামী অত্যুচ্চানন্দ ইতিমধ্যে এক দিন এসে হাজির হলেন। হসন্তবাবু তাঁকে তাঁর ফাইল বের ক'রে দেখালেন কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন রূপে নারীর কাপুরুষতার কুফল ফলছে। স্বামীজি বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েই বললেন যে, এত দিন পরে হসন্তবাবু ভারতের রোগ ঠিক ধরেছেন। হসন্তবাবু একটু বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "এখন ওdata যথেষ্ট পাওয়া যায় নি; তা ছাড়া এইটাই যে ভারতীয় অবনতির কারণ এই conclusion (সিদ্ধান্ত)টি এখনও সব রকম logical test (ন্যায় বিচার) ক'রে establish (প্রতিপন্ন) করা হয় নি। এ ঘটনাটি যে সময়ে ঘটে তখন হসন্তবাবুর হাতে মাত্র ৩৫০০টি উদাহরণ জমা ছিল।" কিন্তু আরও হাজারখানেক কেস না পেলে তিনি কিছুই সঠিক বলতে পারছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁর ফাইলে ৪৫৫৩টি কেস হওয়াতে তিনি তাঁর কাজে লেগে গেলেন। প্রথমত, তিনি স্ত্রী-কাপুরুষতার উদাহরণগুলিকে ভাল ক'রে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে নিলেন। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীজাত কুফলাবলি লিপিবদ্ধ ক'রে ফেললেন। তার পর সেই সমস্ত কুফলের সঙ্গে আমাদের জাতীয় অবনতি যে যে রূপে প্রকাশ পায়, সেই সেই অবস্থা ও ঘটনা-নিচয়ের সঙ্গে মেলে কি না দেখে নিলেন। তার পর দেখলেন স্ত্রী-কাপুরুষতা ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় বিভিন্নতার ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় অবনতির সম্বন্ধ কি! এইরূপ নানা উপায়ে ভেবে, চিন্তে, কষে, খড়িপেতে হসন্তবাবু শেষ অবধি নিম্নলিখিত রূপ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যথা—

১। নারীর কাপুরুষতা একটি সত্তা।

২। এই সত্তার নানা প্রকার রূপ আছে অর্থাৎ ইহা নানা কার্য্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

৩। এই সত্তার প্রাবল্য বিবিধ প্রকার অর্থাৎ কোথাও ইহা ক্ষীণভাবে প্রকাশ পায় ও কোথাও প্রবলরূপে প্রকাশ পায়।

৪। এই সত্তা ফল-প্রসূ অর্থাৎ ইহা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়, ইহা দ্বারা ফলাফলের উৎপত্তি হয়।

৫। এই সত্তার ফলাফল সাধারণত জাতীয় গুণ ও দোষ রূপে পরিগণিত হয়।

৬। এই সত্তার অভাবে জাতীয় গুণের প্রকাশ দেখা যায় এবং ইহার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ প্রকৃষ্ট হয়।

৭। এই সত্তার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ ইহার প্রাবল্যের অনুপাতে কম বা বেশী দেখা যায়।

৮। এই সত্তা অবিনাশ্য নহে।

৯। এই সত্তা আমাদের জাতীয় দুর্গতির প্রধানতম কারণ।

এ ছাড়া তিনি একটা গ্রাফ এঁকে দেখিয়ে দিলেন যে, নারী-কাপুরুষতা ও জাতীয় অবনতির উদাহরণ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই ভাবে বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এ দুটি positively related। হসন্তবাবু এই সিদ্ধান্তগুলিতে হঠাৎ উপনীত হলেন না, অনেক তর্ক মীমাংসা ক'রে তবে এগুলি তিনি স্থির নিশ্চয় ব'লে প্রচার করলেন। প্রথমত তিনি "The Nine Points of National Narcolepsy" ব'লে একটি পুস্তিকা বের ক'রে ফেললেন। এতে তিনি দেখালেন যে, আমাদের জাতি এই যে কোন কিছুতেই সক্ষম হয় না, এই যে আমাদের জাতি কিছুতেই এক টানা জাগ্রত অবস্থায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পারে না, এই যে সর্ব্ব ঘটে আমাদের জাতি মাত্র অর্দ্ধ-জাগ্রত, এই যে আমাদের জাতি দুঃখে দারিদ্র্যে নিঝুম হয়ে প'ড়ে রয়েছে, এ সবের কারণ আমাদের নারীদের সাহসের অভাব এবং তৎপ্রসূত সন্তানদের উপর এই ব্যাধির প্রভাব।

"Hasanta's Nine Points" শীঘ্রই ভারতময় ছড়িয়ে পড়ল। নানা জায়গায় জাতীয় অবনতির কারণ-নির্দ্ধারক এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিচার নিয়ে মীটিং ইত্যাদি হ'তে আরম্ভ হ'ল। হসন্তবাবু চারি দিক থেকে কন্‌গ্রাচুলেশন পেতে লাগলেন কংগ্রেসেও এই নিয়ে বেশ একটা নাড়াচাড়া প'ড়ে গেল। কয়েকজন নারীসভ্য তাঁদের নামে এই অপবাদ শুনে রাগে উন্মত্তের মত হয়ে পুরুষ সভ্যদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন। হসন্তবাবু যে দু চারখানা মারের ভয়-দেখান বেনামী চিঠিও না পেলেন, তা নয়। যাই হোক, শেষ অবধি সকলেই হসন্তবাবুর অকাট্য Statisticsএর কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন এবং ভারতকে আবার তার লুপ্ত গৌরব ফিরে দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হ'তে লাগল। হসন্তবাবু প্রেস ও পাব্‌লিককে জানালেন যে, নারীদের আবার সাহসী ক'রে তোলবার একটা স্কীম তাঁর খসড়া করা আছে; আর্থিক সুবিধার আশা দেখলে তিনি সেটা finally set up করাতে রাজি আছেন। এই আশা পাবামাত্র 'বীরপ্রসূ প্রসবিনী ভারত' নামে একটি সঙ্ঘ মান্দ্রাজ অঞ্চলে গঠিত হয়ে টাকা তোলার কাজে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। হসন্তবাবুও তাঁর স্কীমটাকে ঘষে মেজে ঠিক করতে লাগলেন।

২

হসন্তবাবুর স্কীমটা ছিল খুবই সিম্প্‌ল এবং সহজবোধ্য। হসন্তবাবুর যখন বয়স খুব অল্প তখন তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসেমশায়কে ক্ষেপা কুকুরে কামড়েছিল। তাতে তাঁকে কসৌলি যেতে হয় ও সেখানে মহামতি পাস্তুরের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা ক'রে তিনি জলাতঙ্কের আশঙ্কা থেকে মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরে আসেন। পাস্তুরের চিকিৎসার মূলমন্ত্র মানুষের কোন বিষয়ে ক্রমশ শক্তিলাভের ক্ষমতায় বিশ্বাস। যে বিষ শরীরে অধিকমাত্রায় অকস্মাৎ প্রয়োগ করলে মানুষ অচিরে দেহত্যাগ করে, সেই

বিষই যদি ক্রমশ তাকে সইয়ে অল্প অল্প ক'রে ক্রমবর্দ্ধনশীল মাত্রায় তার প্রতি প্রয়োগ করা যায়, তাহ'লে তার অপকার তো কিছু হয়ই না, বরং উক্ত বিষ সম্বন্ধে তার এমন একটা প্রতিরোধক ক্ষমতা ও অব্যাহতি জন্মায় যে, বেশীমাত্রায় ঐ বিষে আক্রান্ত হ'লেও তার আর কিছু হয় না। পাগলা কুকুরের বিষ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও মানুষের মধ্যে ঐ রকম উপায়ে ক্রমশ উৎপন্ন করা হয়। বাল্যকালের এই জ্ঞানটুকু এতদিনে হসন্ত-বাবুর কাজে লেগে গেল। তিনি ভাবলেন, জলাতঙ্ক যদি চিকিৎস্য, তাহ'লে সর্বাতঙ্ক নয় কেন? অর্থাৎ ক্রমশ ভয় প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব-ভয় কেন একেবারে দূর করা যাবে না?

তাঁর এক ভাগ্নের (বিভক্তির বড় ছেলে তদ্ধিতকুমারের) বড় আঁধারের ভয় ছিল। হসন্তবাবু তাকে প্রথমে কিছুদিন ৩২ ক্যাণ্ডল পাওয়ার আলোযুক্ত একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলেন, তার পর আলোর ক্যাণ্ডল পাওয়ার ক্রমশ কমিয়ে কমিয়ে শেষ অবধি তাকে একেবারে নিরেট অন্ধকারে রেখে দেখলেন তদ্ধিতের অন্ধকারের ভয় আর নেই। এই এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌টা সফল হওয়ায় হসন্তবাবু আর বিলম্ব না ক'রে তাঁর নারীজাতির ভয় দূরীকরণের স্কীমটা প্রকাশ ক'রে ফেললেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, অনেক গবেষণা ক'রে তিনি ভয় জিনিষটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—১। শারীরিক ভয়, ২। মানসিক ভয়, ৩। আধ্যাত্মিক ভয়; এবং দেখেছেন যে, এই তিন প্রকার ভয়ই চিকিৎসা ক'রে দূর করা সম্ভব। চিকিৎসার প্রধান ও একমাত্র উপায়, অল্প অল্প ক'রে ভয় সহ্য করিয়ে মানুষকে ক্রমশ ভয়শূন্য ক'রে তোলা। যথা, শারীরিক ভয় দূর করতে হ'লে ছারপোকার ভয় থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ ভালুকের ভয় অবধি সইয়ে সইয়ে দেখাতে হবে। মানসিক ভয় দূর করতে হ'লে, একলা থাকা কিম্বা অন্ধকারের ভয় থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশ খুব বেশী রকম ভূতের ভয় অবধি দেখাতে হবে। আধ্যাত্মিক ভয়ও ঐ উপায়ে 'মাষ্টার মশাই রাগ করবেন' ব'লে ভয় দেখান থেকে সুরু করে, 'ভগবান বিমুখ হবেন' অবধি ব'লে সারান যাবে।

হসন্তবাবু ঠিক করলেন মেয়েদের ভয় ভাঙাবার জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা Central Institute খুলবেন; সেখানে ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে মেয়েরা সব রকম ভয় বিমুক্ত হবার জন্য তাঁর তত্ত্বাবধানেই চলবে। তিনি একবার তাড়াতাড়ি মান্দ্রাজ চ'লে গেলেন। সেখানে 'বীরপ্রসূ প্রসবিনী ভারত' সঙ্ঘের সভ্যেরা তাঁকে একটা তুমুল-রকম রিসেপশন দিল; সকলে একবাক্যে হসন্তবাবুকে উক্ত সঙ্ঘের কীর্ত্তিকার-প্রধান (Working President) মনোনীত করলে; এছাড়া এক জন সার্দ্ধপ্রধান (Vice-President) এক জন সর্ব্বার্থাধার (Treasurer), তেরো জন ভ্রাম্যমান প্রতিভূ (Travelling Agents), ও বিয়াল্লিশ জন নৈষ্ঠিক কার্য্যনায়ক (Members of the General Committee) নিযুক্ত হ'ল। হসন্তবাবু পরম উৎসাহে কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং

শীঘ্রই অনেক হাজার টাকা তুলে ফেললেন। তার পর চার পাঁচ মাস ধ'রে খুব হৈ চৈ চারি দিকে লোকের মুখে শুধু এক কথা—"বীরপ্রসূ প্রসবিনী ভারত"। সকলে শুধু 'The Nine Points of National Narcolepsy" আওড়ায় ও ব'লে, "এইবার হুসন্তবাবু জাতীয় অবনতির একটা হেস্ত-নেস্ত না করে ছাড়বেন না।"

৩

মধুপুরে একটা মস্ত বাড়ি আর বাগান নেওয়া হয়ে গেছে। যারা নিজেদের মেয়েদের ভয় ভাঙাবার জন্য ব্যস্ত, তাদের লেখা আবেদন-পত্রে হুসন্তবাবুর দপ্তর গিজগিজ করছে। Imperial Bankএ "বীরপ্রসূ প্রসবিনী সঙ্ঘে"র account বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। এখন শুধু কাজ আরম্ভ হ'লেই হয়; হুসন্তবাবু সঙ্ঘের কীর্ত্তিকার-প্রধান হিসেবে কাগজে দুই জন সৎ, কর্ম্মক্ষম ও বয়স্কা মেট্রনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেকে দরখাস্ত করলে এবং বহু কষ্টে হুসন্তবাবুর আবিষ্কৃত Honesty ও Efficiencyর Infallible Nose Test পাস করে (নাকের মাপ ও আকারের সাহায্যে হুসন্তবাবু মানুষের চরিত্রবিচার করতে পারতেন) দুই জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলা মেট্রন নিযুক্ত হলেন। অতি শীঘ্রই মধুপুরের বাড়ি ছাত্রীতে ভরপুর হয়ে উঠল। হুসন্তবাবু তারাপদ নামক এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি পাস এক জন ছোকরাকে নিয়ে সেখানে সব বন্দোবস্ত করতে চলে গেলেন। ছাত্রীদের দৈহিক এবং বংশ ও জাতিগত কোন অবস্থার জন্য তাদের মধ্যে ভয়ের প্রদুর্ভাব হয়েছে কি না নির্ণয় করবার জন্য হুসন্তবাবু তাদের বিষয়ে নানাপ্রকার Statistics নিলেন। যথা, তাদের মাথার মাপ, চুলের ও গায়ের রং, নাকের দৈর্ঘ্য, ভুরুর আকৃতি, ওজন, শরীরের দৈর্ঘ্য, ফোর-আর্ম বাইসেপ্‌স, চেষ্ট, ওয়েষ্ট ইত্যাদির মাপ, তাদের দেহে কোথায় কোথায় তিল আছে, তাদের জাতি, গোত্র, পারিবারিক খবরাখবর, বাল্যকালে হাম হয়েছিল কি না, তাহারা অত্যধিক চা পান করে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। তারাপদ বললে, অত data সে একলা ক্লাসিফাই ও রেকর্ড করতে পারবে না। হুসন্তবাবু তাতে তারাপদর সাহায্যার্থে তিন জন বি. এ. ফেল কেরানি নিযুক্ত করে দিলেন।

তার পর আরম্ভ হ'ল প্রত্যেকটি মেয়ের Fear Survey অর্থাৎ তার কি কি প্রকার ভয় আছে এবং সেই সব ভয়ের প্রাবল্য কতটা ইত্যাদি। কারুর নামের পাশে হয়তো লেখা হ'ল Physical, minimum—cockroach; Mental, minimum—darkness five candle; Spiritual, minimum—maternal uncle go away for ever, অর্থাৎ উক্ত বালিকার আরসুলা মাত্র দেখলেই ভয় হয়, অন্ধকারে এবং পাঁচ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার আলো থাকলেও ভয় হয়, এবং মামা তাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাবেন এইটুকু মাত্র আশঙ্কা হ'লেই

ভয় হয়। অন্যান্য সব মেয়েদের নামে এইরকম সকল জ্ঞাতব্য বিষয় লেখা এক এক খানা কার্ড তৈরি হ'ল। সেগুলি triplicateএ রেকর্ডেড হ'ল।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে যাবার পরে হসন্তবাবু দেখলেন যে, শারীরিক ভয় জিনিষটাই মেয়েদের মধ্যে খুব বেশী এবং অধিক সংখ্যক মেয়েরই বাল্যকালে হাম হয়েছিল এবং প্রায় সকলেই চা পান করে। হসন্তবাবু এর ফলে 'বীরপ্রসূ প্রসবিনী সঙ্ঘে'র সভ্যাদের মধ্যে বিতরিত হবার জন্য একটা নোট লিখলেন—Physical Fear and its Probable Relation to Infantile Measles and Exeessive Tea Drinking.

এর পর তিনি সকলের জন্য রুটিন তৈরি ক'রে দিলেন। Emil Cone আবিষ্কৃত Auto-suggestionএর নিয়ম অনুসারে এবং প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ক'রে "আমি বীরনারী হব, হবই হব" ইত্যাদি জপ করবার একটা গাথা তৈরি করে দিলেন। মধুপুরের বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড লেকচার হল ছিল। সেখানে প্রত্যহ মেয়েদের হসন্তবাবুর জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শুনতে হ'ত। প্রথম দিনকতক তিনি ভয় যে শুধু একটা negative অথবা অভাবাত্মক বা নেতিগর্ভ জিনিষ সে সম্বন্ধে মেয়েদের ভাল ক'রে বোঝালেন। অর্থাৎ সাহসের অভাবই ভয়, অর্থাৎ সাহস নেই বলেই ভয় আছে, অর্থাৎ সাহস থাকলে ভয় থাকতে পারে না ইত্যাদি। এ কথাও বললেন যে, ভয়টা নেতিগর্ভ বলেই তার থাকা না-থাকার কোন মানে হয় না, অর্থাৎ ভয় না থাকলেই সাহস আছে প্রমাণ হয় না, সুতরাং না-ভয়-না-সাহসাত্মক এই যে একটা neutral বা নির্লিপ্ত বা অনির্দ্দিষ্ট অবস্থা, প্রথমত তাদের মনের মধ্যে সেই অবস্থাটা আনতে হবে, তার পর Positive Courage বা অস্ত্যাত্মক সাহস গড়ে তুলতে হবে, ইত্যাদি।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা শুনিয়ে মেয়েদের মধ্যে চিকিৎসার জমি তৈরি ক'রে হসন্তবাবু এক দিন কলকাতায় চলে এলেন। উদ্দেশ্য প্রথম মাত্রা ঔষধের বন্দোবস্ত ক'রে মধুপুরে ফিরে যাওয়া ও যথারীতি চিকিৎসা সুরু করা। দু তিন রাত্রি জেগে, অনেক ভেবে ও স্বামী অত্যুচ্চানন্দের সঙ্গে অনেক পরামর্শ ক'রে হসন্তবাবু চিকিৎসার প্রথম মাত্রা হিসেবে মেয়েদের কি ভয় দেখাবেন তা ঠিক করলেন। খুব ছোটখাট রকম ভয় দেখান হবে এটা ঠিকই ছিল, তবু ঠিক কি ভয় দেখান হবে সেটা হঠাৎ না ভেবে নির্দ্ধারণ করা উচিত নয় বলেই এতটা দেরি হ'ল।

এই জিনিষটা ঠিক হয়ে যাবার দিনচারেক পরেই হসন্তবাবু দুটি বড় বড় কাঠের সিন্দুক নিয়ে মধুপুরে ফিরে গেলেন। কেউ জানতে পারলে না যে, সেগুলিতে কি আছে। মেট্রনরাও না। পর দিন সকালবেলা হসন্তবাবু মেয়েদের লেকচার হলে হাজির হতে বললেন। সিন্দুক দুটি আগেই সেখানে ঠিক মত ক'রে বসান হয়েছিল। মেয়েরা সকলে এল। কিছু একটা মজার ঘটনা হবে ভেবে মেট্রন কাদম্বিনী ও সুমতিবালাও এসে বসলেন। হলের চার দিক বন্ধ। শুধু হসন্তবাবুর আসনের পিছনে একটা বড় ও

আধ-ভেজান দরজা। প্রথমত, মেয়েরা সকলে দণ্ডায়মান হয়ে বীরনারী হওয়ার গাথাটা সমস্বরে আবৃত্তি করলে। যথা—

বীরনারী গাথা

তারাপদ রচিত *

তামিল, তেলেগু অথবা বাঙালী হইব রমণী বীর,
পতিতান্ত্যজ, ব্রাহ্মণ, কেবট তুলিব উচ্চ শির।
হায়, নহিক বীরের নারী,
তাহে মোরা কি করিতে পারি—
নিজেরা সবলা হইয়া আমরা দূরিব লাজ পতির—
(মোরা) মাথা খাড়া করি তুলিব দেশের লাজ অবনত শির।

স্বামী কাপুরুষ, কাপুরুষ পিতা, ভ্রাতা কাপুরুষ হোক—
বীর সন্তান গর্ভে ধরিয়া সৃজিব নূতন লোক!
মোরা আনিব নূতনালোক,
সখি ভুল' তবে মিছে শোক—,
এলায়িত চুলে কোমর বাঁধিয়া হও সবে সুস্থির—
নূতন শিক্ষা কর পত্তন উঁচাইয়া তোল শির।

ভাব দ্রৌপদী, Joan†, তারাবাই আর বগিবিন্দীর‡ কথা,
Sangerদিদি উঠে লেগেছেন ঘুচাতে মোদের ব্যথা।
ভেঙে ফেল ক্ষীণ দেহলতা,
ধর পাদপের সবলতা;
মনু, পরাশর, সোপেনহাউরে যে ভাবে ভাবুক পীর—
তাদের রচিত শাস্ত্রে লাথিয়া তুলিব উচ্চ শির।

মোরা 'বীরনারী হব, বীরনারী হব' জপে যাব অবিরাম;
গম্ভীর নাদে কাঁপাইব বীর-প্রসূ-প্রসবিনী-ধাম।

---

* হসন্তের সেক্রেটারি
† Joan of Arc
‡ দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' দ্রষ্টব্য

মোরা দাঁড়াব আপন পায়ে—
নহে পুরুষের পদছায়ে ;
এ মহামন্ত্রে পর্দ্দা জেনানা ফেটে হবে চৌচির—
জয় হসন্ত কৃপায় যাঁহার উঁচা করিয়াছি শির।

তার পর হসন্তবাবু তাঁর বেগুনে রেশমের চাদরটা একটু ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, "আজ আমরা এখানে যে জন্ম সমবেত হয়েছি সে একটা খুব উচ্চ আদর্শ নিয়েই। এই ঘটনা হয়তো প্রথম দর্শনে চমকপ্রদ নয়, কিন্তু এরই প্রভাব ভারত ইতিহাসের অতি দূর ভবিষ্যৎ অবধি পৌঁছাবে। আপনারা সকলে একান্ত মনে আমাদের বীরপ্রসূ প্রসবিনী সঙ্ঘের মহান আদর্শের কথা চিন্তা করুন ও 'আশুহাসিনী ভারতমাতা' গানটি সকলে মিলিয়া করুন।" হসন্তবাবু এই উপায়ে মেয়েদের মধ্যে একটা অতর্কিত ভাব জাগাচ্ছিলেন কেন না ভয় দেখান জিনিষটা আকস্মিকতার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। গান আরম্ভ হ'ল।

আশুহাসিনী ভারত মাতা

(স্বামী অত্যুচ্চানন্দ রচিত)

আশুহাসিনী ভারত মাতা—
অভাগা এ তোর সন্তান দলে
মুখ তুলে চেয়ে হরষে মাতা'।—

একবার হাস মা
তুমি অনেক কেঁদেছে অনেক কেটেছ
সুখ-নীরে একবার ভাস মা ;
দুখ নিশি ভোর হ'ল হ'ল ওই
চোখ চেয়ে একবার হাস মা।

ওমা ভেঙেছে মোদের মোহ মায়া ঘোর
বুকে বেঁধে সব হাসি দেখে তোর ;
জেগে দেখ নহ জড়িত-নয়না
নাহি শুধু তব ছিন্ন কাঁথা।
আশুহাসিনী ভারতমাতা।

একবার হাস মা—
সেই পুরানো-যুগের সুবেশ-সাজে
দৈন্ত মোদের নাশ মা—
সেই হেম-ঝলমল রজত-ধবল
প্রাণ খোলা হাসি হাস মা।

জাপান হাসিছে হাসিতেছে চীন,
রিক্ হাসে হাসে তুর্কী নবীন—
তুমি হাস মাগো বুকেতে তোমার
আর ইংরেজ পেষে না জাঁতা।
আশুহাসিনী ভারতমাতা॥

মেয়েরা যখন অন্তরাতে এসেছে ও "প্রাণ খোলা হাসি হাস মা" বলিয়া ভৈরবীতে ভারতমাতাকে হাস্য করতে আহ্বান করছে, এমন সময়ে হসন্তবাবু একটা দড়িতে সজোরে টান দিলেন। অমনি সিন্দুকের ডালা দুটি খুলে গেল এবং তার ভিতর থেকে কিচকিচ শব্দে হল মুখরিত ক'রে প্রায় হাজার খানেক ছোট বড় ইঁদুর লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। গানটাও হঠাৎ থেমে গেল।

তার পর যা দৃশ্য, তার বর্ণনা অসম্ভব। ভয়ব্যাকুল মেয়ে সকলে সমস্বরে ই...... ... করে একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠল। দুচার জন দৌড়ে হসন্তবাবুর পিছনের দরজাটির দিকে চলল। তাদের দেখাদেখি বাকি সকলেই একটা প্রবল বন্যার মতই দরজার দিকে ছুটল। ঘরময় তখন ইঁদুরের ছড়াছড়ি। মেয়েরা এ ওর ঘাড়ে প'ড়ে ও পরস্পরকে সরিয়ে আগে পালাবার চেষ্টায় জামা কাপড় ছিঁড়ে, নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দরজার উপর গিয়ে পড়ল। হসন্তবাবু একবার উঠে তাদের থামাতে গেলেন, কিন্তু সেই সর্ব্বসংহারিণী বন্যার মুখে তিনি রেশমের জামা কাপড় সমেত কোথায় যে তলিয়ে গেলেন, তা বোঝাই গেল না।

কয়েক মিনিট ঘরে যেন ঝড় বয়ে গেল; তার পর বেশীর ভাগ মেয়েরা পালিয়ে যাবার পর দেখা গেল, ঘরে অসংখ্য জীবিত, মৃত ও পদদলিত ইঁদুর, দুই একটি মূর্চ্ছিত মেয়ে, কয়েকপাটি জুতা ও কিছু চুড়ি বালা ও ব্রোচ। আর দেখা গেল, এক পার্শ্বে হসন্তবাবুর ধূলিমলিন ছিন্নবস্ত্র ভগ্নচশমা রূপ। তিনি সর্ব্বাঙ্গে উঁচু 'হীলে'র আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে বহু কষ্টে উঠবার চেষ্টা করছেন, শুধু মেট্রন কাদম্বিনী পলায়ন কালে তাঁর হাঁটুর উপর ব'সে পড়ায় তজ্জাত বেদনায় উঠতে পারছিলেন না। শেষে বহু কষ্টে তিনি হামাগুড়ি দেবার ভাবে এগিয়ে গিয়ে মানিব্যাগটা কুড়িয়ে নিলেন, তার পর খানিকক্ষণ কাতুকুতু আক্রান্তভাবে ছটফট করে একটা ইঁদুরকে ল্যাজ ধ'রে পাঞ্জাবির ভিতর থেকে টেনে বের

কাতর হয়ে কেঁদে দিলেন। তিনি হামা দিয়ে ক্রমশ দরজার দিকে এগিয়ে চললেন ও বলতে লাগলেন, "Overdose, overdose, ইঁদুরটা না দিয়ে আরশুলাটা দিলেই ঠিক হ'ত।

Overdose ! Overdose !!

খালি স্বামিজীর কথায় এটা করলাম। এর evil effect দূর করতে এখন অন্তত দু সপ্তাহ লাগবে। তার পর আবার আরশুলা দিয়ে কাজ আরম্ভ করব। *Vulneratus non victus* !*"

---

* বিক্ষত কিন্তু বিজিত নহে।

পাঁচুগোপাল ডিটেক্‌টিভ

সে এক ব্যাপার! এখনও মনে করলে হাসি পায়। পাঁচুগোপালের পক্ষে বেখাপ্পা রকম কাজ করা অবশ্য কিছু-একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, কিন্তু সে বার পাঁচু নিজেকেও হার মানিয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই পাঁচুর মনে একটা বৈজ্ঞানিক ভাবের ধারা বইত। বৈজ্ঞানিক পাঁচু যে সারাক্ষণই খুব উঁচুদরের বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করত তা নয়; এই যাকে বলে কিনা অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স্, অর্থাৎ ফলিত বিজ্ঞান, তার উপরেই ছিল তার আসল ঝোঁক। পাঁচুর একটা ধারণা ছিল যে, পুরান কাজ নূতন রকমে ক'রে, অথবা নিত্য নূতনতর কোন আবিষ্কার ক'রে জগতের উপকার করার জন্যই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কথাটা আশ্চর্য্য রকম নূতন কিছু নয়, কিন্তু সে কথা নেপথ্যে বলাই ভাল; পাঁচুর কানে গেলে আর রক্ষা নেই।

সব-কিছুই বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখা পাঁচুর স্বভাব ছিল এবং তার জন্য সে বিপদেও বড় কম পড়ে নি।

আমরা তখন কলেজে পড়ি এবং এক মেসেই থাকি। পাঁচু সপ্তাহ খানেক খুব গম্ভীর হয়ে কি ভাবত। অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে সে বললে যে, সে একটা নূতন জ্ঞান লাভ করেছে, এবং সেই জ্ঞান জগতে বিস্তার করাই সেই সময় থেকে তার জীবনের উদ্দেশ্য। সে নাকি বুঝতে পেরেছে যে, মনুষ্য-জাতির ঘ্রাণশক্তি ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং এর বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান ক'রে সে জানতে পেরেছে যে, মানুষ ঘ্রাণশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করে না বলেই তার এমন অমূল্য শক্তিটি হেলায় হারাচ্ছে। এই বিষয়ে চেষ্টা ক'রে সে কলেজে একটা বিতর্ক (debate) করলে। আমরাও মজা দেখবার জন্য তাকে খুব উৎসাহিত করলাম। বিতর্কে পাঁচু উঠে বললে, "If necessity is the mother of invention, she is the grand-mother of existence—অর্থাৎ প্রয়োজন যদি উদ্ভাবনার মাতা হয়, তাহ'লে তা অস্তিত্বের মাতামহী।" কথাটার মধ্যে পাঁচুর মতে সমস্ত দর্শন বিজ্ঞানের সারাংশটুকু ছিল। এগার রাত্রি জেগে বিজ্ঞান-বারিধির ভিতর থেকে সে গুণীজনের মত এই ক্ষীরটুকু সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু কলেজের ছেলেরা তার এমন ন্যায়ের প্যাঁচটা না বুঝে অযথা তার নাম grandfather of existence, অর্থাৎ অস্তিত্বের ঠাকুরদাদা দিয়ে দেওয়ায় পাঁচুর মনে বড়ই আঘাত লেগেছিল। আমাদের আশা সে ছেড়ে দিলে। কিন্তু পাঁচু দমবার ছেলে ছিল না, সে বললে, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে!" সে ঠিক করলে যে, যে সব পশুর ঘ্রাণশক্তি খুব

ব্যবহার করে, তাদের মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে সে নিজের ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ রকম বাড়িয়ে ফেলবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম ক'রে যেমন সার্কাসের জোয়ালো লোকেরা অমানুষিক শক্তি সঞ্চয় করে, তেমনি পাঁচুও তার ঘ্রাণশক্তিকে ব্যায়াম করিয়ে শক্তিশালী ক'রে তুলবে ঠিক করলে।

তখনও ছুটির অনেক বাকি; কাজেই হঠাৎ ঘ্রাণশক্তির ব্যায়াম করা সম্ভব হয়ে উঠল না। এতে পাঁচুর মনে একটা চাপা উত্তেজনা থেকে গেল। সে ভাল ক'রে ঘুমাতে পারত না।

খগেন আমাদের মেসের গল্পবাজ ছিল। সে একটা কথা পাঁচুর নামে রটিয়ে দিলে। অবশ্য তাতে পাঁচুর বিশেষ যায় আসে নি। খগেন তার রুমমেট ছিল। সে এক দিন সকালে উঠে চা খাবার সময় বললে, "কাল রাত দুটোর সময় পাঁচু কি করেছে জান হে?" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কি করেছে?" "হঠাৎ দুপুর রাতে এক লোমহর্ষক চীৎকার ক'রে পাঁচু তক্তার উপর সটান উঠে বসল। চুলগুলো খাড়া, মুখ লাল। আমি একেবারে ভড়কে গিয়েছিলাম। একটু গোঁ গোঁ ক'রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ও বলতে লাগল—'কাইনেসিস, কাইনেসিস! ব্যায়াম ও ব্যবহারই অনন্ত উন্নতির চৌরঙ্গী! এমন দিন আসবে যখন সমাজে গুপ্তঘাতককে শিক্ষিত ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে তার গোপন আবাস থেকে টেনে হিঁচড়ে এনে সুবিচারের মমতাহীন কবলে আছড়ে ফেলে দেবে। মানুষের মন অনন্ত ক্ষমতার আবাস। চাই জাগিয়ে তোলা—উন্মেষ—বিকাশ। কিসের এ বর্ত্তমান! কাইনেসিথেরাপি, অর্থাৎ সঞ্চালন-চিকিৎসায় মানব কি না হবে!' এই বলতে বলতে পাঁচু এতটা উত্তেজিত হয়ে গেল যে আমি ওর গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে না দিলে কাল রাত্রে একটা অঘটন কুঘটন কিছু ঘটে যেত।" আমরা এক চোট হেসে নিলাম। পাঁচু সেখানে ছিল না। চাকরকে খোঁজ করতে বললাম। সে এসে বললে, "পাঁচুবাবু মুখ হাঁ ক'রে ছাদে রোদ পোয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, চা খাবে নি বাবু? বাবু বললে, দাঁতের ব্যথার চিকিচ্ছে করছে রোদ দিয়ে। হ্যাঁ বাবু, রোদে কি ব্যথা শুকোয়?"

সে বার ছুটির সময় পাঁচু তার ঘ্রাণশক্তি বাড়াবার বিশেষ চেষ্টা করেছিল। রোজ সে ঘরে নানা রকম শিশিতে নানা রকম জিনিষ রেখে চোখ বুজে কোন্‌টা কি তা শুঁকে ঠিক করতে চেষ্টা করত। বাগানের গাছপালা সব শুঁকে চিনবার চেষ্টা করত। এতে তার সত্যিই অনেকটা উপকার হয়েছিল। কিছু দিন পরে সে চোখ বুজে, হামা দিয়ে চলত। ঘরে বাগানে নানা রকম জিনিষ রেখে দিত, আর শুঁকে পথ ঠিক করতে চেষ্টা করত। কখনও কখনও, সে অচেনা গন্ধ পেত এবং তার অনুসরণ করত। এক দিন তাই ক'রে সে নাকি একটা খরগোস প্রায় ধ'রে ফেলেছিল। এতে তার উৎসাহ খুব বেড়ে গেল। কিন্তু আর এক দিন সন্ধ্যা বেলায় বাগানে শুঁকে শুঁকে একটা অজানা জানোয়ারকে বের করতে গিয়েই কিছু কালের মত তার উন্নতির পথে বাধা প'ড়ে গেল।

কে একটা জাঁতিকল বাগানে পেতে রেখেছিল। চোখ বুজে যেতে যেতে তার নাকটা তাতে আটকে গেল। ফলে ভীষণ গোলমাল ও ছুটোছুটি প'ড়ে গেল। নাকটা বাঁচল বটে, কিন্তু নাকের ডগায় জাঁতিকল ঝুলিয়ে বৈজ্ঞানিক পুত্র যখন পিতৃসন্দর্শনে উপস্থিত হলেন, তখন পুত্র-গৌরবে মুগ্ধ পিতা বলতে বাধ্য হলেন যে, ঐ রকম পাগলামো করলে তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র না ক'রে পারবেন না। অগত্যা মত না বদলালেও পাঁচু প্রকাশ্যে সুপ্ত শক্তিকে আর জাগাতে চেষ্টা করত না। নাকের দাগটা তার অবশ্য গেল না, কিন্তু পাঁচু তাতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করত না'।

এর থেকে বোঝা যায় যে, পাঁচু সাধারণ মানুষ নয়। সে নিজেও তাই ভাবত।

এর পর সে বৈজ্ঞানিক ভাবে মহাভারত বিশ্লেষণ সুরু করলে। ভারতবর্ষ জগৎকে এক দিন যে জ্ঞান দিয়েছিল, সেই লুপ্তজ্ঞান আবার জগতে ফিরিয়ে আনতে তার খুব একটা উৎসাহ দেখা গেল এবং ফলে আমাদের বাঁচা দায় হ'ল। তার উদ্ভাবনী-শক্তি হঠাৎ এত বেড়ে গেল যে, এমন কি বৈজ্ঞানিক মেসে ঝি চাকর টেঁকা দায় হয়ে উঠল। নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, ফাঁদ-কল ইত্যাদি সে তৈরি করতে সুরু করল এবং মেসের সকলেরই হাত পা সেগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে লাগল যে, কলিযুগের কুরুক্ষেত্র ঠেকিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ল। অবশেষে যখন সে নাগপাশ অথবা অটোম্যাটিক মালটি-লুপ ল্যাসো (Automatic Multi-loop Lasso) তৈরি করলে, তখন আমরা অগত্যা একটা খারাপ রকম ষড়যন্ত্র ক'রে সেটা পুড়িয়ে তবে নিজ হস্তে রান্না বাজার ও বাসন মাজার হাত থেকে নিস্তার পেলাম। দেখে দেখে আমাদের চোখে ওসব এমন সয়ে গিয়েছিল যে, প্রথমে যখন ছাদের উপর দড়ি দড়া কাঠ বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে সে আর একটা কি তৈরি করলে তখন আমরা অতটা নজর দিই নি। কিন্তু এক দিন স্নানের সময় আমরা চার জন ছেলে, দুজন চাকর ও ঝি গোবিন্দর মা উঠোনের কলতলায় গিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ ঝুপ ক'রে অনেকগুলি দড়ির ফাঁস আমাদের গায়ে পড়ল এবং কোন গোলমাল করবার আগেই আমরা ফাঁসে বাঁধা অবস্থায় দশ বার হাত শূন্যে উঠে গেলাম।

হতভম্ব হয়ে ছাদের দিকে চেয়ে দেখলাম পাঁচু মন দিয়ে একবারটি আমাদের দেখলে এবং 'ঠিক হয়েছে' ব'লে একটা হাতল ঘুরিয়ে আমাদের নামিয়ে দিলে। গোবিন্দর মা শুধু টাল সামলাতে না পেরে চৌবাচ্চায় প'ড়ে গেল। ভিজে কাপড়ে বিস্ফারিত নেত্রে উপরে একবার তাকিয়েই সেই যে সে বাড়ি গেল, তার পর তাকে আর দেখি নি। এই নাগপাশ পুড়িয়ে দেওয়ায় পাঁচুর কি রাগ!

এর পরে সে অভিমন্যুর ব্যূহ-ভেদের মূলমন্ত্রটা এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেললে। এমন নাকি একটা উপায় আছে যা জানলে অতি ভীষণ ভিড়ের মধ্যে এক জন মানুষ অবাধে ঢুকে যেতে পারে এবং তাও আবার কোন রকম অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্য না

নিয়ে। টেবিলের উপর দেশলাই-কাটি সাজিয়ে আঁকজোক কেটে পাঁচু কত রাতের পর রাত কাটিয়ে দিলে। তার পর এক দিন ভোরবেলা সে চেঁচিয়ে বললে যে, অভিমন্যুর গুপ্তজ্ঞান সে পুনরাবিষ্কার করেছে এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় জিনিষটা জলগতি-বিজ্ঞানের (Hydrokinetics) মধ্যে পড়ে। খগেন বললে, "খুব বেশি ভিড় ভেদ ক'রে যাওয়া অবশ্য ঐ জাতীয় সমস্যা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।" পাঁচু মানে না বুঝে এতে খুব খুশি হয়েছিল।

আমাদের সকলের ফুটবল খেলা দেখার বেশ ঝোঁক ছিল। সেদিন মোহনবাগানের সঙ্গে ক্যাল্‌কাটার ম্যাচ। আমরা চারটে না বাজতেই যথাস্থানে হাজির,—কিন্তু তবু দেখি ভীষণ ভিড়। 'মোহনবাগান' নামটার মধ্যেই কিছু আছে কি না জানি না, কিন্তু ওদের খেলা দেখতে বাংলা দেশ ভেঙে পড়ে। আবার মজা এই যে, যে মানুষ খেলা যত কম বোঝে, সে তত আগে খেলার জায়গায় ভিড় করে। ভিড় দেখে পাঁচু বললে, "আমার নিজের কোনই ভয় নেই, কেন না আমি অবাধে সামনে গিয়ে হাজির হব—তবে তোমাদের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে"—ইত্যাদি। আমরা অবশ্য কিছু বললাম না। একটু দাঁড়িয়ে পাঁচু পকেট থেকে একটা টুক্-বই বের ক'রে একবার কি সব দেখে নিলে, এবং বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে দুর্ব্বোধ্য ইংরেজি কথা অনেকগুলি ব'লে নিলে। তার পরেই দেখলাম পাঁচু হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। অভিমন্যুর লুপ্তবিদ্যা পাঁচু তবে নিশ্চয়ই ফিরে পেয়েছে ভেবে আমরা মনে মনে পাঁচুকে হিংসা করছি এবং নিজেদের অক্ষমতাকে গাল দিচ্ছি, এমন সময় সামনে একটা ভীষণ গোলমাল উঠল। গোলমালের মধ্যে কার একটা সরু মোটা সুর মেশান গলা পরিষ্কার শোনা যেতে লাগল—"বে-আক্কেলে—আমার পাঁজরে কনুয়ের গুঁতো দিয়ে সামনে যাচ্ছিল; উঃ বাপ! যা লেগেছে—মার···" তার পর সে গলাটা আর শোনা গেল না। খুব একটা 'মার মার' ধ্বনি এবং অনেক সম্বন্ধ-বৈচিত্র্য-সূচক শব্দ মিশে এক তুমুল গোলমাল সুরু হ'ল। হঠাৎ এক জায়গায় ভিড়টা একটু ফাঁক হয়ে তার পরমুহূর্ত্তেই সেইখান দিয়ে পাঁচু ছিটকে বেরিয়ে এল। গায়ের জামা তার ছেঁড়া, চুলও বোধ হয় কিছু কম, চটি জোড়ার একটা নেই; হাতে কেবল সেই পকেট-বুকটা আঁকড়ে ধ'রে সে হুমড়ি খেয়ে এসে বাইরে পড়ল। এক জন বেশ কালো মোটা লোক বিকট হুঙ্কার দিয়ে, এক এক বারে প্রায় বার তের ইঞ্চি লম্বা লাফ দিয়ে দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। উদ্দেশ্য—তাকে 'শিক্ষা' দেওয়া। আমরা দেখলাম বেজায় বিপদ। যা শিক্ষা পাঁচু পেয়েছে তাতেই রক্ষা নেই, আরও পেলে সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মশির কিম্বা পাশুপত অস্ত্র আবিষ্কার ক'রে একটা সর্ব্বনাশ করবে; কাজেই আমরা সদলে পাঁচুকে বাঁচাতে ছুটলাম।

মোটা লোকটি তখন তেইশ লাফে বাইশ ফুট জমি পার হয়ে ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে পাঁচুর ঘাড়ের উপর প্রায় এসে পড়েছেন। জয়ের আশায় তাঁর চিবুকের চাম থাক

নিষ্প্রয়োজন চর্ব্বি নিষ্ঠুর আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অতি সুক্ষ্ম আদ্দির পাঞ্জাবির অন্তরালম্বিত তাঁর তেরো-তলা ভুঁড়িটি সদর্পে দুলে দুলে উঠতে লাগল। পাঁচুর প্রাণ ঐ ঘটোৎকচরূপীর আলিঙ্গনে পড়লে মহাভারতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইহজন্মের মত ওইখানেই শেষ হ'ত। মরিয়া হয়ে খগেন তাঁকে একটি লেঙ্গি মেরে 'অবস্থার গতি' সম্বন্ধে ফিরিয়ে দিলে। এক জন নিরপরাধ পাহারাওয়ালাকে জড়িয়ে তাঁর উপুড়াবস্থা-লাভটা সকলের চোখে এতই সরস লেগেছিল যে, তখনকার মত পাঁচুর অস্তিত্বের প্রমাণ-গুলো তারা সম্পূর্ণ ভুলেই গেল। সুবিধা দেখে পাঁচুও ইত্যবসরে স'রে পড়ল। মেসে ফিরে দেখি, পাঁচুর ঘরে খিল। রমেন ইয়ার বললে, "পাঁচু অভিমন্যুর দাদা, সে শুধু ব্যূহ ফুঁড়ে ঢুকতেই শিখেছিল, কিন্তু পাঁচু নিষ্ক্রমণটাও আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে।"

২

এখন আসল গল্পটা বলি। এতক্ষণ পাঁচুর একটু পরিচয় দিচ্ছিলাম। পাঁচু আজকাল আর ছাত্র নয়। সে এম. এস-সি., বি. এল. পাস ক'রে ওকালতি করছে। অর্থাৎ পুলিস-কোর্টের প্রত্যেকটি ইট পাথর আজকাল সে চিনে ফেলেছে। এ ছাড়া সে বর্ত্তমানে বিবাহিত। তার শ্বশুর সরকারী কাজে শিমলায় থাকতেন, কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্য সকলে কলকাতাতেই ছিলেন। পাঁচুর এতে কোনও আপত্তি ছিল না, কেন না সে শ্বশুরের চেয়ে স্ত্রীকেই বেশি প্রয়োজনীয় মনে করত। শ্বশুরের আবার বদরাগী ব'লে একটা দুর্নাম ছিল। কাজেই পাঁচুর শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ নেই ব'লে যে সে খুব কষ্টে ছিল তা বলা যায় না।

আমরা সকলেই তখন নানা কাজে নানা জায়গায় ছিলাম। পরস্পরের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত, কিন্তু অনেক কাল খুব জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হয় নি। এতে বড় দুঃখ হ'ত। খগেন তখন বর্দ্ধমানে ছিল। আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, দিন কতক তার ওখানে গিয়ে আড্ডা জমাব। অবশ্য পাঁচু না হ'লে আমাদের দল ঠিক পূর্ণ হবে না, কাজেই তাকে অনেক ক'রে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বৈবাহিক, সামাজিক, আর্থিক বা বৈজ্ঞানিক কোন আপত্তিই তার শোনা হ'ল না।

ওকালতি সুরু করবার পর থেকেই সে তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি অপরাধ-বিজ্ঞানের (criminology) চর্চ্চায় লাগিয়েছিল। সে বলত, অপরাধ জিনিষটা যে বেখাপ্পা একটা ঘটনা নয়, তারও একটা কারণ আছে, এটা প্রমাণ করা দরকার। আবার কারণটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীর স্বভাবজাত, এ কথাটা বিশেষ ক'রে মনে রাখা প্রয়োজন। পাঁচু আরও বলত যে, পৃথিবী তার অবিশ্রাম গতির পথে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে এক এক সময় যায়। সেই সময় পৃথিবীতে অপরাধাধিক্য দেখা যায়।

অর্থাৎ ঐ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষের মন সামাজিকতা অবিচলিত রাখতে পারে না। কাজেই সে অসামাজিক কাজ করে। অপরাধ ও অসামাজিক কাজ একই কথা। বিদ্যুতের তাড়নায় না প'ড়েও অবশ্য বিশেষ ক'রে অপরাধ করতে পারে, এমন লোক অনেক জন্মায়, এবং তাদের ভাল ক'রে চিনবার উপায় থাকলে যথাসময়ে গারদ ব্যবহার ক'রে সমাজকে অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচান যায় এই জন্ত অপরাধীরা যে ধাঁচের মানুষ তাহার (the criminal type) বিশেষ চর্চা প্রয়োজন। পাঁচুর মতে এমন দিন আসতে পারে, যখন জন্ম রেজেষ্টারি করবার সময়েই অপরাধপ্রবণতা-নির্দেশক কল (criminality indicator) দিয়ে সন্তোজাত শিশু ভবিষ্যৎ কালে কি প্রকার লোক হবে তা ঠিক জানা যাবে এবং অপরাধী-জাতীয় শিশুদের গোড়ার থেকেই বন্ধ ক'রে রেখে জগৎ থেকে অপরাধ চিরকালের মত দূর ক'রে দেওয়া যাবে।

তার মতে যুদ্ধ জিনিষটা নাকি বড় ধরণের অপরাধ-উৎসব ; আর যুদ্ধ বাধে ঠিক সেই সময়, যখন ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী কোন একটা খারাপ রকম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভিতর এসে পড়ে। এই বিদ্যুৎ ঠিক কি ধরণের জিনিষ এখনও জানা যায় নি, কিন্তু শীঘ্রই যাবে এবং তার পর থেকে পণ্ডিতেরা ঠিক সময়ে জগৎকে যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতে পারবেন। যখনই পৃথিবী কোন খারাপ রকমের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কাছে আসবে, তখন সকলে "বিদ্যুৎপ্রুফ" (protective cloaks and masks) পোষাক ও মুখোস পরতে বাধ্য হবে। ফলে, বাইরের যুদ্ধ বা অপরাধ-বন্যা (war or crime wave) মানুষকে ছুঁতে পারবে না। বিজ্ঞানের এমনই কত উন্নততর অবস্থার কথা ভেবে পাঁচু ভাবে বিভোর হয়ে যেত।

যাই হোক, আমাদের বর্দ্ধমানে দিন কাটছিল মন্দ নয়। পাঁচু লম্ব্রোসোর ক্রিমিন্তাল টাইপ্‌স (criminal types) বইখানাকে একমাত্র ছেলের মত সাদরে কোলে আঁকড়ে ব'সে থাকত, আর আমরা অবোধের মত তাস-খেলা বা বাজে বকায় সময়ের অপচয় করতাম। পাঁচু কিছুতেই বুঝতে পারত না যে, কতকগুলো নোংরা ও বিশ্রী মুখ আঁকা কাগজ হাতে ক'রে লোকে অত চেঁচায় কেন! সে আমাদের ভালর দিকে আনবার চেষ্টা প্রায়ই করত। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে তাকে কখনও দেখতাম না।

তাকে এবারে লম্ব্রোসোতে পেয়েছিল। তাস ব্যাধিগ্রস্ত আমাদের সে কি শ্রেণীতে ফেলত জানি না, কিন্তু এ ব্যাধি থেকে মুক্ত ক'রে আমাদের লম্ব্রোসোগ্রস্ত করতে তার উৎসাহের অবসান কখনও দেখা যেত না। লম্ব্রোসো নাকি অসাধারণ লোক ছিলেন— তা নইলে যে পাঁচু কখনও তাঁর কথা বলত না বা তাঁর বই পড়ত না, তা বলাই বাহুল্য। অপরাধীমানবতত্ত্ব বিষয়ে লম্ব্রোসোর আবিষ্কার ও বিচার মহামূল্য এবং তাঁকে ঐ বিষয়ে যুগ-প্রবর্ত্তক বলা চলে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দেখে অপরাধী ধাঁচের মানুষ চেনা যায় ; এবং এ বিষয়ে বর্ত্তমান বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পাঁচুর লম্ব্রোসোর

মন্তে দৃঢ় বিশ্বাস এক তিলও তাতে কমে নি। আমরাও এতে কোন আপত্তি করতাম না।

এক দিন আমাদের আড্ডা বেশ জ'মে আসছিল। পাঁচুও তার লম্ব্রোসোখানা বন্ধ ক'রে একমনে ভাবের শাঁস খাচ্ছিল। এমন সময় এক গোলমাল উপস্থিত হ'ল। বাইরে দরজায় দুমদাম ক'রে ঘা দিয়ে মোটা গলায় কে বললে, "বাবু, টেলিগ্রাম।" আমাদের সকলেরই মনে হ'ল, নিশ্চয় কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, নইলে টেলিগ্রাম কেন? পাঁচু শুধু নির্ব্বিকার হয়ে ভাব খেতে লাগল। কিন্তু অদৃষ্টের ফের! দেখা গেল যে তারই শালার কাছ থেকে টেলিগ্রামটা আসছে। "পাঁচুর স্ত্রীর বেজায় অসুখ; এখনই তাকে যেতে হবে।" বেচারা পাঁচু প্রায় কেঁদে ফেললে। বৈজ্ঞানিক হ'লেও তার মনটা বড় নরম ছিল। আমি বললাম, আমিও তার সঙ্গে যাব এবং যদি মিসেস পাঁচুর তেমন কিছু না হয়ে থাকে, তাহ'লে তাঁর অসুখ সেরে গেলে দুজনেই আবার ফিরে আসব।

তাড়া-হুড়ো ক'রে পঞ্জাব মেল ধরা গেল। ভীষণ ভিড়। বহু কষ্টে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একটু জায়গা ক'রে বসলাম। গাড়ীতে প্রাণহীন বাক্স, প্যাটরা তো অসংখ্য এবং তা ছাড়া দুটি ফিরিঙ্গি, এক জন পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক এবং জনকতক বাঙালী। পাঁচু প্রথমটা চুপ ক'রে ব'সে ছিল, কিন্তু আমার মনে হ'ল যে সস্তা চুরুটের ও আক্রা এসেন্সের গন্ধে আমার অশিক্ষিত ঘ্রাণশক্তিই আমার জীবনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে, না জানি বেচারা পাঁচুর অবস্থা কি সাংঘাতিক। কাজেই তাকে একটু প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কাজটা খুব শক্ত হ'ল না। লম্ব্রোসোর কেতাবখানা পাঁচুর হাতেই ছিল এবং স্ত্রীর অসুখ সম্বন্ধে আমি তাকে কিছু আশা দেবার পরেই সে বেশ উৎসাহিত হয়ে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নিযুক্ত হ'ল।

একটি রোগা ফিরিঙ্গি নিজের শুঁটকো আঙুলগুলি নিয়ে ক্রমাগত নিজের হাতের উপর চটাপট লাগাচ্ছিল। ঠিক যেন বাঁয়া-তবলা বাজাচ্ছে। পাঁচু খানিক নিরীক্ষণ ক'রে বললে, "ওর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে ওর পকেট-কাটা ব্যবসা, অথবা ও লোহার সিন্দুকের তালা খুলতে ওস্তাদ।" আমি বললাম, "কেন হে, ওকে তো বেশ ভাল লোক ব'লেই মনে হচ্ছে।" পাঁচু আমায় খোঁচা দিয়ে সেই দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "আরে না, দেখছ না, ওর আঙুলগুলি কেমন চঞ্চল; ক্রমাগতই নড়ছে, একটুও স্থির হ'তে পারছে না। তার কারণ ওর আঙুলের স্নায়ুগুলি বেজায় শক্তিশালী। অর্থাৎ আঙুল দিয়ে ও খুব সূক্ষ্ম রকমের কাজ করতে পারে। ঐ ধরণের লোকেরাই পিক্‌পকেট ইত্যাদি হয় ভাল।"

আমি বেচারা চুপ ক'রে রইলাম। বইখানায় আবার খানিক ডুব মেরে একটু পরে মুখ তুলে চোখের ইসারা ক'রে একটি লোককে দেখিয়ে পাঁচু বললে, "আর ঐ যে

সূচিপত্র

আনন্দ-বাজার

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৪৩

প্রকাশক
শ্রীসজনীকান্ত দাস
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রবোধ নান
শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

নিবেদন

গ্রন্থ লিখিত গল্পগুলি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে যেন নায়ক নায়িকাদের পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। কারণ আংশিক ভাবে এই জাতীয় চরিত্র বাংলায় বিরল নহে। কিন্তু মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। নাট্যকার বলিলেই শেক্সপিয়র মনে হইতে পারে, কিন্তু নাট্যকার মাত্রেই শেক্সপিয়র নহেন। এই হেতু অনুরোধ যেন গুণবিশেষ দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া পাঠক ভ্রম না করেন। যদি পাঠক বিশেষ কোন ভূমিকায় নিজ স্বরূপ দেখিতে পান, যেন ক্রুদ্ধ না হন। আমি তাঁহাকে কিছুমাত্র অবমাননা করিবার চেষ্টা করি নাই। তাঁহার গুণ তাঁহাতেই শোভে; অপরে যেন তাঁহার অনুকরণ করিয়া সমাজে হাস্যাস্পদ না হন, ইহাই প্রচেষ্টা। এ সকল কারণ সত্ত্বেও বাংলার সকল নরনারীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পুস্তকখানি লোক সমাজে উপস্থিত করিলাম।